হিন্দু রসায়নী বিদ্যা

4341(12)

শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র রায়

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিশ্ব
12

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিদ্যার বহুবিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্ম ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এ-রকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন। শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি, মানসিক সচেতনতার অভাব, বা অন্য যে-কোনো কারণেই হউক, আমরা অনেকেই স্বকীয় সংকীর্ণ শিক্ষার বাহিরের অধিকাংশ বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত। বিশেষ, যাঁহারা কেবল বাংলা ভাষাই জানেন তাঁহাদের চিন্তানুশীলনের পথে বাধার অন্ত নাই; ইংরেজি ভাষায় অনধিকারী বলিয়া যুগশিক্ষার সহিত পরিচয়ের পথ তাঁহাদের নিকট রুদ্ধ।

যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধন বর্তমান যুগের একটি প্রধান কর্তব্য। বাংলা সাহিত্যকেও এই কর্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না। তাই এই দুর্যোগের মধ্যেও বিশ্বভারতী এই দায়িত্বগ্রহণে ব্রতী হইয়াছেন।

॥ ১৩৫২ ॥

৩৭. হিন্দু সংগীত : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী ও শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
৩৮. প্রাচীন ভারতের সংগীত-চিন্তা : শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল
৩৯. কীর্তন : শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
৪০. বিশ্বের ইতিকথা : শ্রীসুশোভন দত্ত
৪১. ভারতীয় সাধনার ঐক্য : ডক্টর শশিভূষণ দাশ গুপ্ত
৪২. বাংলার সাধনা : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪৩. বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ : ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৪৪. মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
৪৫. নব্যবিজ্ঞানে অনির্দেশ্যবাদ : শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
৪৬. প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা : ডক্টর মনোমোহন ঘোষ
৪৭. সংস্কৃত সাহিত্যের কথা : শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী
৪৮. অভিব্যক্তি : শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

। ১৩৫৩ ।

৪৯. হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা : ডক্টর সুকুমাররঞ্জন দাশ
৫০. ন্যায়দর্শন : শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য
৫১. আমাদের অদৃশ্য শত্রু : ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫২. গ্রীক দর্শন : শ্রীশুভব্রত রায় চৌধুরী
৫৩. আধুনিক চীন : থান য়ুন শান
৫৪. প্রাচীন বাংলার গৌরব : শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

হিন্দু রসায়নী বিদ্যা

শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র রায়

4341 (12)

SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE BANIPUR

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর গলি, কলিকাতা

শ্রীভবেশচন্দ্র রায় কর্তৃক সংকলিত ও অনূদিত

6865

প্রকাশ, ১ অগ্রহায়ণ ১৩৫০
পুনর্মুদ্রণ চৈত্র ১৩৫২

মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস, ৩০, কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা
১১০০—১২. ১১. ৪৩

ভূমিকা

বহুবর্ষ পূর্বে আমরা যখন বালক ছিলাম তখন ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গের লেখায় পড়িতাম প্রাচীনকালের হিন্দু পণ্ডিতেরা কেবল মনস্তত্ত্ব লইয়াই থাকিতেন। কিন্তু আধুনিক অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চর্চাতেও প্রাচীন ভারত তদানীন্তন অন্যান্য সভ্যদেশের অপেক্ষা বহু পরিমাণে শ্রেষ্ঠ ছিল। যখন সুশ্রুত, রসার্ণবতন্ত্র, রসরত্নসমুচ্চয় প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থোক্ত পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণসমূহের কথা পাঠ করি তখন মনে বড় ক্ষোভের উদ্রেক হয়। কি ছিল, কি হইয়াছে! যে দেশে সুশ্রুত বলিয়াছিলেন, 'শবব্যবচ্ছেদ ভিন্ন চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করা অসম্ভব', সেই দেশে শব স্পর্শ করা পর্যন্ত নিষিদ্ধ হইয়া গেল; যে দেশের অভিজাতবর্ণ সুবর্ণরত্নপরীক্ষা, ধাতুবাদ (metallurgy), ধাতু ও ঔষধসমূহের সংযোগ-ক্রিয়ার জ্ঞান, ক্ষারনিষ্কাশন প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ গৌরবের বিষয় বিবেচনা করিতেন সেই দেশে সেকরা ও কামারের কাজ উচ্চ জাতির অবজ্ঞার বিষয় হইয়া উঠিল; যে দেশের মনীষী ঢুণ্ঢুকনাথ বলিয়াছিলেন,—

> অধ্যাপয়ন্তি যদি দর্শয়িতুং ক্ষমন্তে
> সূতেন্দ্র কর্মগুরবো গুরবস্ত এব।
> শিষ্যাস্ত এব রচয়ন্তি গুরোঃ পুরো যে
> শেষাঃ পুনস্তদুভয়াভিনয়ং ভজন্তে।

অর্থাৎ, "যাঁহারা শিক্ষণীয় বিষয় পরীক্ষা দ্বারা দেখাইতে পারেন তাঁহারাই প্রকৃত শিক্ষক। যে সকল ছাত্র শিক্ষকের নিকট হইতে পরীক্ষাগুলি শিখিয়া নিজে নিজে সেইগুলি করিতে পারেন তাঁহারাই যথার্থ শিক্ষার্থী। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য শিক্ষক ও ছাত্রগণ রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা মাত্র।"—সেই দেশের কবিরাজগণ শরীরবিজ্ঞান বিষয়ক পরীক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া চিকিৎসাবিদ্যার শিক্ষকতা করিতে লাগিলেন। বস্তুত যেদিন হইতে সমাজের বুদ্ধিমান ও বিদ্বান লোকেরা শিল্পবিজ্ঞানের চর্চা ত্যাগ করিয়া তাহার ভার অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর লোকের উপর অর্পণ করিলেন সেইদিন হইতে

আমাদের অধঃপতন আরম্ভ হইল। নাপিতের হস্তে অস্ত্রচিকিৎসা ও বেদের হস্তে উদ্ভিদবিজ্ঞানের আলোচনার ভার ন্যস্ত করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত মনে পরলোকচিন্তায় ব্যস্ত হইলাম।

তবে দেশের হাওয়া ফিরিয়াছে, নূতন উদ্যম লইয়া ভারতীয় যুবকেরা বিজ্ঞান চর্চায় আত্মনিয়োগ করিতেছে। তাহাদের মৌলিক গবেষণাসমূহ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছে। ইহা দেখিয়া স্বতই মনে আশার সঞ্চার হয়।

এই অধঃপতিত জাতিই একদিন বিজ্ঞানচর্চায় জগতে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছিল ভাবিলে ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশার উদ্রেক হয়। চরক ও সুশ্রুত, কণাদ ও বরাহমিহির, নাগার্জুন ও চুণ্ডুকনাথের প্রতিভা আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছি; ভবিষ্যতের চিত্রে ইহার প্রভাব কেনই বা পড়িবে না!

সার্ধদ্বিসহস্র বৎসর পূর্বে তক্ষশিলার সুবিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবক 'কোমারভচ্চ' আত্রেয় মুনির চরণোপান্তে উপবেশন করিয়া চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কিংবদন্তি আছে যে ব্যাকরণবেত্তা পাণিনি এবং প্রাচীন ভারতের ম্যাকিয়াভেলি সুপ্রসিদ্ধ রাজনীতিবিশারদ চাণক্যও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। জীবক যে 'কোমার-ভচ্চ' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন সেই উপাধির অর্থ প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চা সম্বন্ধে গবেষণাকারী মাত্রেরই সুপরিজ্ঞাত। ইহা সংস্কৃত 'কৌমার-ভৃত্যে'র পালি অপভ্রংশ; 'কৌমার-ভৃত্য' আয়ুর্বেদের অষ্টশাখার অন্যতম। এক কথায় বলিতে গেলে জীবক ধাত্রীবিদ্যা ও তৎসংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। আমরা এক্ষণে সেই সুদূর অতীতের অবস্থা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করিতে অক্ষম। প্রাচীন ভারতে যে কেবল নানাবিধ শিল্প ও বিজ্ঞানের অনুশীলন হইত তাহা নহে, পরন্তু কেহ কেহ তাহার মধ্যে কোন এক বিষয়ে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া তাহাতে বিশেষজ্ঞ বলিয়াও পরিগণিত হইতেন।

হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আজ আর কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। এই সম্পর্কে ইংলণ্ডের বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর মুখপত্র 'নেচার' (Nature) যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে বলা হইয়াছে, "আমরা যে সকল আবিষ্কার পাশ্চাত্ত্য জাতিগণ কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে মনে করিতাম, এখন দেখা যাইতেছে তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি প্রাচীন হিন্দুগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। 'রসার্ণবতন্ত্র' প্রভৃতি পুস্তকে ঊর্ধ্বপাতন, অধঃপাতন, তির্যক্‌পাতন, ধাতুনিষ্কাশন প্রভৃতির বর্ণনা পাঠ করিলে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ইংলণ্ডে বেকন যে পরীক্ষা-পদ্ধতির কথা প্রচার করেন, বহুকাল পূর্বে প্রাচীন ভারতের বুধমণ্ডলীর নিকট তাহা সুপরিচিত ছিল।" অতঃপর ঢুণ্ঢুকনাথের কথা উদ্ধৃত করিয়া নেচার বলিয়াছেন যে, "শিক্ষাদান কার্যে পরীক্ষার (experiment) সাহায্য যে কিরূপ ফলদায়ক তাহাও হিন্দুগণ বিস্মৃত হন নাই।"

জগতের প্রাচীন জাতিরা রসায়নশাস্ত্রে কতখানি ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিল ইহা জানিবার জন্য প্রথম হইতেই আমার আগ্রহ ছিল অসীম। এই উদ্দেশ্যে আমি প্রায় দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া টমসন, হোয়েফার ও কপের প্রাথমিক গ্রন্থনিচয় সর্বদা পাঠ করিয়াছি; বলিতে গেলে এক সময় এই সকল গ্রন্থ ছিল আমার সঙ্গের সাথী। এগুলি ভালভাবে অধ্যয়ন করিতে গিয়া রসায়নশাস্ত্রের আলোচনায় প্রাচীন ভারতের স্থান কোথায় ইহা আমি অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এইজন্যই চরক সুশ্রুত প্রভৃতি যে সমস্ত আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ কালের করাল গ্রাস হইতে আত্মরক্ষা করিয়া আজিও বর্তমান রহিয়াছে, রাসায়নিকের দৃষ্টি লইয়া সেগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই অনুসন্ধানে যখন আমি ব্যস্ত তখন ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রসায়নবিজ্ঞানের তদানীন্তন আচার্য ফরাসী পণ্ডিত মসিয়ে বার্থেলোর সহিত আমার পত্রালাপ হয়। রসায়ন-বিজ্ঞানের অতীত ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে আমাদের উভয়ের এই যোগাযোগ আলোচনার ধারায় একটি নূতন গতির সঞ্চার করিল। বার্থেলো ছিলেন

প্রাচীন ইউরোপের রসায়নচর্চার ইতিহাস সম্বন্ধে অদ্বিতীয় পণ্ডিত। এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তিনি অনেক নূতন তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছেন, অনেক ভ্রান্ত ধারণা দূর করিতে সাহায্য করিয়াছেন। এক পত্রে তিনি আমাকে প্রশ্ন করিলেন, রসায়নবিজ্ঞানে প্রাচীন হিন্দুগণের দান কতটুকু। এ সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া দিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতেও আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহার এই অনুরোধে উৎসাহিত হইয়া ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে আমি তাঁহাকে হিন্দু আলকিমি ও তন্ত্রশাস্ত্রের একখানি পুস্তিকা উপহার দিলাম। পুস্তিকাখানি 'রসেন্দ্রসারসংগ্রহ' অবলম্বনে লিখিত। পুস্তিকাখানির প্রকৃত মূল্য আমি তখন বুঝিতে পারি নাই এবং ইহা যে হিন্দুরসায়ন সম্বন্ধে তথ্যবহুল ইহাও আমার ধারণা ছিল না। মসিয়ে বার্থেলো এই পুস্তিকা সম্বন্ধে নিজের সুচিন্তিত অভিমত সহ একটি সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশ করিলেন এবং আমাকে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস' শীর্ষক গ্রন্থের তিন খণ্ডই উপহার পাঠাইলেন। মধ্যযুগের রসায়নচর্চা বিশেষ করিয়া রসায়নশাস্ত্রে আরব ও সিরিয়াবাসীদের অবদান সম্বন্ধে এই গ্রন্থ লিখিত। গ্রন্থখানি আদ্যন্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া হিন্দু রসায়ন সম্বন্ধে অনুরূপ একখানি গ্রন্থ লিখিতে আমার প্রবল ইচ্ছা জন্মিল।

এই ইচ্ছার ফলেই ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজী ভাষায় 'হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাসে'র প্রথম অংশ ও ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে উহার দ্বিতীয় ও শেষাংশ প্রকাশিত হয়।

আমার প্রিয় ছাত্র শ্রীমান্ ভবেশচন্দ্র রায় পুস্তকখানির একটি সংক্ষিপ্ত অনুবাদ সংকলন করিয়াছেন। শ্রীমান্ ভবেশের সাহিত্যিক বলিয়া খ্যাতি আছে, বর্তমান অনুবাদ ও সংকলনে তাহা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আমার ধারণা। আমি তাহার পাণ্ডুলিপি পড়িয়া দেখিলাম এবং তাহার অনুবাদ ও সার-সংকলনের কৃতিত্বে মুগ্ধ হইলাম।

কলিকাতা
আগস্ট ১৯, ১৯৪৩

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

সংকলয়িতার নিবেদন

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের 'হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস' দেশবিদেশে একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া সমাদৃত। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই গ্রন্থ ইংরেজী ভাষানভিজ্ঞ বাঙালী পাঠক-সমাজের অগোচরে থাকিবে ইহা আমাদের মাতৃভাষার পক্ষে গৌরবের কথা নহে। এইজন্যই আমি এই গ্রন্থ অনুবাদ করিতে সাহসী হইয়াছিলাম। যোগ্যতর ব্যক্তি এই প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিলে নিশ্চয়ই তাহা অধিকতর আনন্দের বিষয় হইত, কিন্তু তাহা যখন এই সুদীর্ঘ একচল্লিশ বৎসরেও সম্ভব হয় নাই তখন তাহার জন্য আর অপেক্ষা না করিয়া সীমাবদ্ধ শক্তি ও জ্ঞান লইয়া আমিই এই চেষ্টা করিয়াছি, ইহাই আমার কৈফিয়ত। আচার্যদেব আজ রুগ্ন ও শয্যাশায়ী, তথাপি তিনি ইহার পাণ্ডুলিপি আগাগোড়া দেখিয়া দিয়াছেন ইহাই আমার একমাত্র সান্ত্বনা।

এই প্রয়াসে প্রেরণা দিয়াছেন পূজনীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় এবং অনুবাদ ও সারসংকলনের কার্যে সাহায্য করিয়াছেন বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দাস। তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

কলিকাতা
আগস্ট ১৬, ১৯৪৩

শ্রীভবেশচন্দ্র রায়

বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু রসায়নী বিদ্যা সম্পর্কে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদিতে বহু আলোচনা করিয়াছেন। ইংরাজী ভাষায় তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ '**A History of Hindu Chemistry**' দুই খণ্ড ছাড়া তিনি বাংলা ভাষায়ও 'নব্য রসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি' নামক একখানি পুস্তক রচনা করেন। উহা ১৩১৩ সালে 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ' হইতে প্রকাশিত হয়। উহাতে তিনি নব্য রসায়নী বিদ্যার আলোচনা প্রসঙ্গে এই বিষয়ে ভারতীয় মনীষিগণের চিন্তা ও সাধনার কথা পাঠকগণকে বার বার স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। কৌতূহলী পাঠক ১৩১০ সালের 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় তাঁহার 'আয়ুর্বেদের প্রাচীনত্ব' এবং ১৩২২ সালের ভাদ্র মাসের 'প্রবাসী'তে 'হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের প্রাচীনত্ব' প্রবন্ধ দুইটিও পাঠ করিলে অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন। 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী' গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে 'প্রাচীন হিন্দুদিগের রসায়নশাস্ত্র-জ্ঞান' এবং 'লাবোয়াসিয়ে ও নব্য রসায়নশাস্ত্রের উৎপত্তি' প্রবন্ধ দুইটিও দ্রষ্টব্য।

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

বৈদিক যুগ

বিভিন্ন সভ্য জাতির রাসায়নিক জ্ঞানের মূল উৎস সন্ধান করিতে গেলে প্রথমেই লক্ষ্য করা যায় যে, সকল ক্ষেত্রেই রাসায়নিক জ্ঞানের মূলে রহিয়াছে চিকিৎসাবিজ্ঞান, ধাতুনিষ্কাষণ এবং পরশপাথরের অনুসন্ধান। অতীত ভারতে রসায়নশাস্ত্রের অনুশীলন প্রধানত চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিপূরক হিসাবেই অনুসৃত হইয়াছিল, পরবর্তী কালে অবশ্য উহা ধর্মানুশীলনের পর্যায়ে পড়িয়া তন্ত্রশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়।

ইউরোপীয় জাতিসমূহ এবং আরববাসিদিগের মধ্যে পরশপাথর ও অমৃতের অনুসন্ধান হইতে রসায়নশাস্ত্রের প্রথম উৎপত্তি। অতঃপর প্যারাসেলসসের সময় হইতে (১৪৯৩-১৫৪১ খ্রী) সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সহায়করূপেই রসায়নের ক্রমবিকাশ সাধিত হইয়াছিল। ভারতে কিন্তু যোগের অঙ্গরূপে রসায়নের সম্যক্ অনুশীলন নিয়মিত ভাবে করা হইত। গজনীপতি সুলতান মামুদের সমসাময়িক আলবেরুনি তাঁহার ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় পুস্তকের একস্থানে লিখিয়াছেন যে পতঞ্জলির মতে রসায়ন মোক্ষলাভের একটি উপায়। ইহার পরে রসায়ন ক্রমশ তন্ত্রশাস্ত্রের সহিত ঘনিষ্ঠ হইতে ঘনিষ্ঠতর রূপে সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল।

হিন্দুর বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের মধ্যে বেদ প্রাচীনতম এবং হিন্দুগণ বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়া বিবেচনা করেন। ঋগ্‌বেদে দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তবে উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহারা অন্ধকে দৃষ্টি এবং খঞ্জকে চলৎশক্তিদানে সমর্থ ছিলেন। গ্রীক পুরাণের দিওস্‌কুরোয়ের (Dioskouroi) সহিত অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। বেদে বর্ণিত বিশ্‌পলা নাম্নী কুমারীর

উপাখ্যানে দেখা যায় বিশ্‌পলার একখানি পা কোন যুদ্ধে কাটা পড়িলে অশ্বিনীকুমারেরা তাঁহাকে লোহার পা তৈয়ারি করিয়া দিয়াছিলেন।

ঋগ্‌বেদের শ্রেষ্ঠ দেবতামণ্ডলীর প্রায় সকলেই মৌলিক পদার্থনিচয় এবং প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহের প্রতীক মাত্র বলিয়া মনে হয়। অগ্নি, বায়ু, সূর্য প্রভৃতি ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এতদ্ব্যতীত রোগনিবারক অথবা রোগপ্রতিষেধক বনৌষধিসমূহকেও দেবগণের সমান মর্যাদা দিয়া অনেক স্তব রচনা করা হইয়াছে। বৈদিক ঋষিগণের মধ্যে সোমলতার পূজা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল, সোমরসকে তাঁহারা অমৃত বলিয়া গণ্য করিতেন। এই সোমরসই দেবতাদিগকে অমরতা দান করিয়াছিল; ইহা ব্যাধিনাশক। সোমদেব রোগমাত্রকেই আরোগ্য করিয়া থাকে।

বেদে রোগনিবারক অনেক ওষধি ও লতাপাতার উচ্ছ্বসিত গুণকীর্তন দেখিতে পাওয়া যায়। একটি স্তবে বলা হইয়াছে, "হে দেব বরুণ, শত সহস্র ওষধি তোমার।"

দুই-একটি শ্লোকের উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বেদের সূক্তে বলা হইয়াছে—

যা ঔষধীঃ পূর্বা জাতা দেবেভ্যস্ত্রিযুগং পুরা।
মনৌ নু বভ্রূণামহং শতং ধামানি সপ্ত চ
শতং বো অম্ব ধামানি সহস্রমুত বো রুহঃ।
অধা শতক্রত্বো যুয়মিমং মে অগদং কৃত ॥

অথর্ববেদে ব্যাধির চিকিৎসায় মন্ত্রতন্ত্রের বহুল উল্লেখ থাকিলেও মূলত ইহা উদ্ভিজ্জ দ্রব্যসমূহের নানাপ্রকার ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্বন্ধীয় তথ্যে পরিপূর্ণ। অথর্ববেদে অপামার্গকে[১] "আরোগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং সমস্ত বনৌষধির রাজ্ঞী" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। হিন্দু চিকিৎসাবিজ্ঞানে আজিও অপামার্গকে রেচক ও মূত্রবর্ধক বলিয়া অতি উচ্চস্থান দেওয়া হয়। একটি

[১] Botanical name—Achyranthes aspera.

শ্লোকে সোমলতা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "এই ব্যক্তিকে আমরা অমৃতের শক্তি পান করিতে দিতেছি, এতদ্ব্যতীত সে যাহাতে শতায়ু হয় তাহার ঔষধ প্রস্তুত করা হইয়াছে।" কুষ্ঠ নিবারণে একটি কৃষ্ণবর্ণ বনজ ওষধির ব্যবহারের উল্লেখ অথর্ববেদে দেখিতে পাওয়া যায়,—"রাত্রিতে তোমার জন্ম, হে লতা! তুমি ঘন চিক্কণ, কৃষ্ণবর্ণী। তুমি এই কুষ্ঠ রঞ্জিত কর এবং ধবল চিহ্ন দূর করিয়া দাও।" কেশোৎপাদনকারী একটি বিশেষ ওষধি সম্বন্ধে অথর্ববেদে বলা হইয়াছে, "দেবী পৃথিবীর বুকে দেবীর ন্যায় তোমার উদ্ভব, হে লতা, আমরা তোমাকে মাটি খুঁড়িয়া তুলিয়াছি, হে নিতত্নি, তুমি কেশসমূহকে দৃঢ় কর। পুরাতন কেশকে শক্ত কর, নূতন কেশ উৎপাদন কর এবং নূতন কেশ যাহা উদ্গত হইয়াছে তাহাকে সুন্দর কর।"

বৈদিক যুগে জন্মগত জাতিভেদ প্রথা বর্তমান না থাকিলেও চিকিৎসা-বিদ্যার চর্চা উত্তরাধিকার সূত্রে আরম্ভ করা হইয়াছিল। ঋগ্‌বেদে জনৈক ঋষি কথাপ্রসঙ্গে বলিতেছেন,—

"আমি শ্লোকরচনাকারী, আমার পিতা চিকিৎসক, মাতা জাঁতায় শস্য পিষিয়া থাকেন। আমরা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ে নিযুক্ত।"[২]

অথর্ববেদ ঋগ্‌বেদের অনেক পরে রচিত। কিন্তু আমরা ঋগ্‌বেদেই হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্রের বহুল উল্লেখ দেখিতে পাই। অথর্ববেদ প্রধানত যাদুবিদ্যা, প্রেতপূজা, মায়াজাল ও সম্মোহনবিদ্যার চর্চায় মুখর। ইহাতে দুষ্কৃতিকারীর প্রতি দুরন্ত অভিশাপ বর্ষণ, শত্রুকে হতবাক্ ও দুর্বল করিবার জন্য নানাপ্রকার মন্ত্রতন্ত্র উচ্চারণ, শত্রুনিধনে বহুবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান, বিবিধ ওষধি প্রয়োগে রমণী বশীকরণ প্রভৃতি বিষয়ের বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে অথর্ববেদের সহিত প্রাচীন মিশরীয় ও গ্রীক শাস্ত্রসমূহের যথেষ্ট সাদৃশ্য বর্তমান।

আপন আপন স্বার্থসিদ্ধি এবং অসদভিপ্রায় চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে

২ R. C. Dutt—*Civilisation in ancient India*—p. 65.

আধিভৌতিক ব্যবস্থার স্মরণ লইবার প্রেরণা দেওয়ায় অন্যান্য বেদের সহিত অথর্ববেদকে সমান আসন বা সম্মান দেওয়া হয় নাই। ঋক্, যজুঃ ও সামবেদ হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থ হিসাবে পূজিত হইয়াছে, কিন্তু আপস্তম্ব, যাজ্ঞবল্ক্য অথবা মনুপন্থীরা অথর্ব বেদকে ধর্মগ্রন্থ বলিয়া স্বীকারই করেন নাই, বরঞ্চ অথর্ববেদোক্ত বিধিসমূহকে নিন্দাই করিয়া গিয়াছেন। বস্তুত প্রাচীন ভারতে হিন্দু চিকিৎসাবিজ্ঞান মন্ত্রতন্ত্র ও যাদুবিদ্যার প্রভাব একেবারে কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই বলিয়া চিকিৎসক-সম্প্রদায়কে কোনদিনই বিশেষ সম্মানের আসন প্রদান করা হয় নাই। হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্রে তাহাদিগকে অবহেলাই করা হইয়াছে এবং প্রধানত এই ব্যবহারশাস্ত্রের মত অনুসরণ করিয়া মহাভারতে চিকিৎসকগণকে 'নীচ' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। তৎসত্ত্বেও একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে অথর্ববেদের গুণগ্রাহী এবং অনুসরণকারীরা কি শত্রুনিপাতে, কি রোগচিকিৎসায় জনসাধারণের বিশেষ করিয়া দেশের শাসকসম্প্রদায়ের প্রভূত কল্যাণসাধন করিয়াছেন।

অথর্ববেদের চর্চা হইতেই ভারতে তথাকথিত 'আলকিমি'র জন্ম হইয়াছে বলিতে পারা যায়। অথর্ববেদে মুক্তা, স্বর্ণ ও সীসকের প্রভূত প্রশস্তি দেখিতে পাওয়া যায়। একটি শ্লোকে বলা হইয়াছে, "বহ্নিসম্ভূত স্বর্ণব্যবহারকারী দীর্ঘ জীবন লাভ করে।" অপর একটি শ্লোকেও উল্লিখিত হইয়াছে, "সূর্যপ্রদত্ত স্বর্ণ উজ্জ্বল বর্ণবিশিষ্ট। যাহারা ইহা ব্যবহার করে তাহারাও দীর্ঘায়ু হয়।" স্বর্ণকে জীবনীশক্তি এবং আনন্দবর্ধক আর সীসককে দুষ্টপ্রভাব দূরীকরণে সমর্থ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যথা—

"সীসকে বরুণ দিয়াছেন আশীর্বাদ, অগ্নি দিয়াছেন শক্তি। ইন্দ্র আমাকে দিয়াছেন এই সীসক, দুষ্টপ্রভাব দূরীকরণে ক্ষমতা ইহার অব্যর্থ।"[৩]

বৈদিক যুগে হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্র পূর্ণাঙ্গ হইয়া গড়িয়া উঠে নাই অথবা ইহা

৩ "To the lead Varuna gives blessing, to the lead Agni gives help. Indra gave me the lead : unfailingly it dispels sorcery."—Bloomfield's Atharva Veda—pp. 62-65.

সর্বাংশে যুক্তিবাদের উপরও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই কিন্তু তাহা হইলেও বেদে এই সম্পর্কে যাহা কিছু উল্লিখিত হইয়াছে তাহাকে নিতান্ত উপেক্ষণীয় মনে করিলে ভুল করা হইবে। হিন্দু রসায়নচর্চার ধারা অনুসরণ করিতে গেলে বৈদিক যুগের পরেই আসিবে আয়ুর্বেদের যুগ। এই যুগে হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্র যুক্তিবাদ ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দু রসায়ন-শাস্ত্রের ইহাই হইল এক গৌরবময় যুগ।

আয়ুর্বেদ

আয়ুর্বেদীয় যুগের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ চরক ও সুশ্রুত। বৈদিক যুগের বিশৃঙ্খল জ্ঞানভাণ্ডারের সুষ্ঠু সংস্কারের পর এই যুগেই প্রথম রসায়নশাস্ত্রের সমধিক উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। চরক ও সুশ্রুতের মধ্যে চরকই প্রাচীনতর। অথর্ববেদ ও চরকের মধ্যে সময়ের ব্যবধান প্রচুর,—সম্ভবত এক সহস্র বৎসর কিংবা ততোধিক। চরকে শ্লেষ্মা সম্পর্কিত নিদানশাস্ত্র পরিপূর্ণরূপে বিবৃত হইয়াছে। রোগনির্ণয় অথবা রোগের গতিপ্রকৃতির বিস্তারিত বিবরণ এই চরকসংহিতায় পাওয়া যায়। পূর্বেই বলা হইয়াছে প্রাচীন ভারতীয় সমাজে চিকিৎসা-ব্যবসায়ীর স্থান আদৌ সম্মানজনক ছিল না, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অথর্ববেদের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া পরবতাকালে কোন সময়ই হিন্দুগণ চিকিৎসাশাস্ত্রকে একেবারে অবহেলা করেন নাই।

চরকের রচনাকাল সঠিক নির্ণয় করা অসম্ভব, মোটামুটিভাবে কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে মাত্র। প্রসিদ্ধ প্রাচ্যতত্ত্ববিদ অধ্যাপক সিলভা লেভি চীনা ত্রিপিটকে চরক নামে জনৈক চিকিৎসা-ব্যবসায়ীর উল্লেখ দেখিতে পাইয়াছেন। ইনি ছিলেন শক-বংশীয় নরপতি কণিষ্কের গুরু। এই কণিষ্ক খ্রীষ্টপরবর্তী দ্বিতীয় শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়। আয়ুর্বেদপ্রণেতা চরক এবং চীনা ত্রিপিটকে উল্লিখিত এই চরক এক ব্যক্তি নহেন। পাণিনিতে চরকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পতঞ্জলি খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন ইহা প্রায় সর্বজনস্বীকৃত। পতঞ্জলি চরকসংহিতার টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, চক্রপাণি-প্রণীত চরকসংহিতার টীকা 'আয়ুর্বেদদীপিকা'য় পতঞ্জলি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

> পাতঞ্জল-মহাভাষ্য-চরকপ্রতিসংস্কৃতৈঃ।
> মনোবাক্কায়দোষাণাং হর্ত্রেঽহিপতয়ে নমঃ ॥

নাগেশ ভট্ট প্রণীত 'লঘুমঞ্জুষা' নামক গ্রন্থেও লিখিত হইয়াছে—

আপ্তো নাম অনুভবেন বস্তুতত্ত্বস্য কার্ৎস্ন্যেন নিশ্চয়বান্
রাগাদিবশাদপি নান্যথাবাদী যঃ স ইতি চরকে পতঞ্জলিঃ ॥

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিয়া চরককে বৌদ্ধপূর্ববর্তী যুগের লোক মনে করিলে বিশেষ ভুল করা হইবে না বলিয়াই মনে হয়। চরকের কাল-নির্ণয় সম্পর্কিত তথ্যাদি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিবার ক্ষেত্র ইহা না হইলেও নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা এই স্থানে করা যাইতে পারে।

সুশ্রুতসংহিতার ন্যায় চরকসংহিতার রচনাপ্রণালী সুসংবদ্ধ ও সাবলীল নহে। চরকসংহিতার এখানে-সেখানে অনেক অবাস্তব ও অসংলগ্ন বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। স্থানে স্থানে পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের অভাব দার্শনিক আলোচনার সাহায্যে গোপন করিবার প্রয়াস চরকে সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান। সুশ্রুত এই দোষ হইতে বহুলাংশে মুক্ত এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে ন্যায় ও বৈশেষিক-দর্শনকে যেরূপ সুসংবদ্ধ ও সুলিখিত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায় চরকের মূলগ্রন্থে ইহারা সেরূপ ছিল না। চরকোক্ত ন্যায় ও বৈশেষিকবাদ পাঠ করিলে পরিষ্কার বুঝা যায় যে এই দার্শনিক মতবাদের তখন কেবল সূচনা আরম্ভ হইয়াছিল মাত্র। চরকের প্রাচীনত্বের ইহাও একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বেদোক্ত দেবতা এবং বৈদিক মন্ত্র ব্যতীত কোন পৌরাণিক কাহিনী চরকে সংকলিত হয় নাই। মানবদেহের অস্থিসংখ্যা নির্ণয়ে চরক বৈদিক মতবাদই অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন এবং ত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত মানুষের শৈশব বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বৈদিক যুগে ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত শৈশব হয়তো বা অত্যধিক অতিরঞ্জিত ছিল না। চরকসংহিতার মতে মানবদেহ ৩৬০ খানি অস্থি সমবায়ে গঠিত। জলির মতে চরকের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে ইহা অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।[৪]

এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল যে হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্রে চরককেই প্রথম সুলিখিত গ্রন্থ বলিয়া মনে করিলে ভুল করা হইবে। পাণিনি যেমন

৪ Jolly—*Introduction to Vishnu*, pp. xviii—xx.

যাস্ক, সাকল্য, শাকটায়ন, গার্গ এবং অন্যান্য পূর্ববর্তী প্রায় চল্লিশখানি ব্যাকরণের সুলিখিত শেষ পরিণতি, চরকও তেমনই তাহার পূর্ববর্তী নানাবিধ আয়ুর্বেদ-গ্রন্থের সুচিন্তিত ও সুলিখিত পরিণত সংস্করণ।

ইহা ব্যতীত চরকসংহিতার ভাষার বৈশিষ্ট্যও ইহার প্রাচীনত্ব প্রমাণে একটি বিশিষ্ট উপাদান। চরকসংহিতার ভাষার সহিত বেদের ব্রাহ্মণের ভাষার যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। অথর্ববেদ ও চরকের মধ্যবর্তী কালে নিশ্চয়ই যুগোপযোগী চিকিৎসাগ্রন্থ প্রণয়ন করা হইয়াছিল। এমন কি চরকের সময়ই অগ্নিবেশ, ভেল, জাতুকর্ণ, পরাশর, হারীত এবং ক্ষারপাণি প্রণীত ছয়খানি প্রামাণিক আয়ুর্বেদ গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল। অগ্নিবেশের গ্রন্থখানিকে[৫] ভিত্তি করিয়াই চরক তাঁহার সংহিতা রচনা করেন। অর্থাৎ অগ্নিবেশের গ্রন্থখানিকে আমূল সংস্কার করিয়া চরকসংহিতার উদ্ভব হয়।

কিঞ্চিৎ মনোযোগের সহিত চরক পাঠ করিলে স্বতই মনে হইবে যে, ইহা যেন একটি আন্তর্জাতিক চিকিৎসকমণ্ডলীর কোন একটি বিশেষ সম্মিলনীর কর্মবিবরণী ও আলোচনা। হিমালয়ের সানুদেশে কোথাও এই সম্মিলনীর অধিবেশন হয় এবং সুদূর বাহ্লীক দেশ হইতেও কাংকায়ন প্রতিনিধি হিসাবে ইহাতে যোগদান করেন।

চরক এবং সুশ্রুত প্রভৃতি প্রামাণিক আয়ুর্বেদগ্রন্থ আলোচনা করিয়া প্রাচীন হিন্দুজগতের রাসায়নিক জ্ঞানের পরিমাপ সম্বন্ধে কোন মোটামুটি ধারণা করিতে হইলে প্রথমেই সাংখ্য এবং বৈশেষিক দর্শনের মূল তথ্য সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। বৈশেষিক দর্শনের স্রষ্টা কণাদ আপনাকে সর্বতোভাবে পদার্থের গুণনির্ণয়ে নিবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। তাঁহার প্রবর্তিত পরমাণুবাদ কতকাংশে গ্রীক দার্শনিক ডিমোক্রিটসের মতবাদের অনুরূপ। শব্দসঞ্চরণ সম্পর্কে তাঁহার অভিমত আজিও বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের

---

৫ অগ্নিবেশ সম্বন্ধে চরক নিজেই বলিয়াছেন যে, "ছয়জনের (গ্রন্থকর্তা) মধ্যে অগ্নিবেশই সর্বাপেক্ষা ধীমান্।"

সঞ্চার করিয়া থাকে। সাংখ্যদর্শনের প্রণেতা কপিল কণাদেরও পূর্বে এই সকল বিষয়ে অনুরূপ আভাস দিয়াছিলেন।

অন্যান্য হিন্দু দর্শনশাস্ত্রের মত সাংখ্যদর্শনও এই কথাই বলিয়াছেন যে মোক্ষলাভের উপায় পূর্ণ জ্ঞান। কপিলের মতে জ্ঞানলাভের তিনটি পর্যায় আছে এবং তাঁহার দর্শনশাস্ত্রে এইগুলিকে তিনি পঁচিশটি সংখ্যায় বিভক্ত করিয়াছেন। এইগুলির বিস্তারিত আলোচনা বর্তমান ক্ষেত্রে অবান্তর। শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে সাংখ্য এবং বৈশেষিকবাদে বিজ্ঞানকে নিস্পৃহ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেই বিচার করা হইয়াছে।

গ্রীক এবং হিন্দু দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে যে আশ্চর্য সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া বহু মনীষী আপন আপন অভিমত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। পণ্ডিত মোক্ষমূলর, অধ্যাপক ম্যাকডোনেল, কোলব্রুক এবং উইলসন সকলেই "হিন্দুদিগের নিকট যে গ্রীক পণ্ডিতগণ ঋণী" একথা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। 'সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস' নামক গ্রন্থে অধ্যাপক ম্যাকডোনেল বলিয়াছেন, "দার্শনিক সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে প্রাচীন গ্রীক ও হিন্দু দার্শনিকগণের মতবাদের মধ্যে বহু সাদৃশ্য বিদ্যমান দেখা যায়। ভগবান ও পৃথিবী একই, বহুরূপে যাহাদের অস্তিত্ব বিদ্যমান মূলে তাহারা মায়া মাত্র, চিন্তা এবং অস্তিত্ব একই—প্রভৃতি এলেয়াতীয় (Eleatic) দার্শনিকদের চিন্তাধারা হিন্দু দর্শনশাস্ত্র উপনিষদ্ ও তাহার পরিণতি বেদান্তেও দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা কোন কালে বিদ্যমান ছিল না তাহার অস্তিত্ব অসম্ভব অথবা যাহার অস্তিত্ব ছিল তাহার সর্বাঙ্গীন বিলোপ সম্ভব নহে এম্পিডোকলসের এই মত সাংখ্যদর্শনোক্ত পদার্থের নিত্যতা এবং অবিনশ্বরতা বিষয়ক মতের সহিত মূলত এক। গ্রীক প্রবাদ অনুসরণ করিলে দেখা যায়, থেলস, এম্পিডোকলস, অ্যানাক্সাগোরাস, ডিমোক্রিটস এবং আরও অনেকে দর্শনশাস্ত্র পাঠ করিবার উদ্দেশ্যে প্রাচ্যদেশ ভ্রমণে যাত্রা করিয়াছিলেন। ইহা

হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে পারস্যের মধ্য দিয়া গ্রীক পণ্ডিতগণ হিন্দু দার্শনিকবৃন্দ কর্তৃক প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন"[৬]—ইত্যাদি।

এইবারে চরকসংহিতায় বর্ণিত বিবিধ সূত্রনিচয়ের মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ হয়ত অপ্রাসঙ্গিক বিবেচিত হইবে না। স্বাদ সম্বন্ধে চরক বলেন,—"জিহ্বার উদ্দেশ্য হইল স্বাদ গ্রহণ***মিষ্ট, টক, লবণ, কটু, তিক্ত ও কষায়—স্বাদের এই ষড়বিধ পর্যায় আছে। *** বস্তুকে সাধারণত তিনভাগে ভাগ করা যায়, যথা জান্তব, ভেষজ ও ভূমিজ। জান্তব পদার্থের মধ্যে মধু, গোরস, নিঃস্থত রস, পিত্ত, চর্বি, মজ্জা, রক্ত, মাংস, মল, মূত্র, চর্ম, শুক্র, অস্থি, শিরা, শৃঙ্গ, নখ, ক্ষুর, কেশ, লোম এবং উজ্জ্বলাভ গোরোচনা ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। স্বর্ণ ও বিভিন্ন ধাতুজ মল[৭] এবং পঞ্চধাতু,[৮] বালি, চুন, রক্তবর্ণ সেঁকোবিষ, মণিমুক্তা, লবণ, গিরিমাটি এবং অঞ্জনকে ভূমিজ ঔষধ বলা হয়।"

চরকসংহিতায় তুঁতে, হীরাকস, মনঃশিলা realgar, হরিতাল ও গন্ধক সহযোগে একপ্রকার ঔষধ তৈয়ারি করিবার প্রণালী বর্ণিত আছে; ইহা দাদ, কাউর, কুষ্ঠ প্রভৃতির মহৌষধ। লৌহ, স্বর্ণ এবং রৌপ্যদ্বারা একপ্রকার বলবর্ধক ঔষধ প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থাও চরকে প্রদত্ত হইয়াছে। একখানি পাতলা লোহার পাতকে বিশেষ উত্তপ্ত করিলে যখন উহা রক্তবর্ণ ধারণ করিবে তখন তাড়াতাড়ি উহাকে গোমূত্রের সহিত মিশ্রিত হরীতকী, আমলকী ও বয়ড়ার কাথের মধ্যে ডুবাইয়া ধরিতে হয়, ইহাই হইল লৌহমিশ্রিত বলবর্ধক ঔষধ (tonic) প্রস্তুতের উৎকৃষ্ট প্রণালী। এইরূপে লৌহের পরিবর্তে রৌপ্য ও

৬ কোলব্রুক বলেন:—"আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে এক্ষেত্রে (পারস্য দেশে) ভারতীয়গণ শিক্ষার্থী না হইয়া শিক্ষক ছিলেন"—History of Sanskrit Literature—pp., 421-22. অধ্যাপক উইলসনও বলিয়াছিলেন "হিন্দুগণ গ্রীকদিগের নিকট হইতে দার্শনিক মতবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা অসম্ভাব্য মনে হয়। যদি বাস্তবিক একে অন্যের মত গ্রহণ করিবার কথা উঠেই তবে শেষোক্তেরাই খুব সম্ভবতঃ প্রথমোক্তদিগের নিকট ঋণী। Trans, Roy. As. Soc. Vol. I, p. 579.

৭ ধাতু ও অক্সিজেন ঘটিত পদার্থ।

৮ রৌপ্য, তাম্র, সীসক, দস্তা এবং লৌহ।

স্বর্ণ ব্যবহার করিয়া যথাক্রমে রৌপ্য ও স্বর্ণঘটিত বলবর্ধক ঔষধ প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

চরকে গুণানুসারে দুই প্রকার ঔষধের নাম পাওয়া যায়। প্রথম প্রকারের ঔষধ সুস্থ ব্যক্তির জন্য। ইহা সেবনে স্বাস্থ্য ভাল থাকে, শরীরে বল সঞ্চার হয়। দ্বিতীয় প্রকার ঔষধ রোগনাশক। রসায়নের সংজ্ঞার্থ নির্দেশ করিতে গিয়া চরক বলেন, যাহা মানুষকে দীর্ঘজীবী করে; স্মৃতিশক্তি বর্ধন করে; স্বাস্থ্য, শক্তি ও পুরুষত্ব দান করে আয়ুর্বেদমতে তাহাকে রসায়ন বলা হয়।

চরক অপেক্ষা সুশ্রুত অধিকতর বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ঔষধের নামকরণ ও রোগনির্ণয়প্রণালী উভয় গ্রন্থে প্রায় একই প্রকার। ভাষার লালিত্যের দিক হইতে বিচার করিতে গেলে সুশ্রুতকে বরঞ্চ শুষ্ক, সারগর্ভ ও সংক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হয়। এবং এই কারণে সুশ্রুতকে চরক অপেক্ষা আধুনিক বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। সুশ্রুতের বর্তমান আকার বৌদ্ধযুগের সুপ্রসিদ্ধ রসায়নাচার্য নাগার্জুনের দান। তিনি সুশ্রুত সংহিতার আমূল সংস্কার করিয়া ইহাকে নব কলেবর দান করেন। চরকে যেমন বিশুদ্ধ চিকিৎসাবিদ্যা লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে সুশ্রুতে তেমনই অবিমিশ্র শল্যতন্ত্রকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। সুশ্রুত পাঠে জানা যায় তৎকালে ভারতবর্ষীয় চিকিৎসক-সম্প্রদায় অস্ত্রচিকিৎসায় অভূতপূর্ব নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন, অবশ্য সাধারণ চিকিৎসায়ও তাঁহাদের দক্ষতা অতুলনীয় ছিল।

সুশ্রুতও কিন্তু অতি প্রাচীন গ্রন্থ। ইহা এত প্রাচীন যে খ্রীষ্টীয় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে পর্যন্ত ইহাকে দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় বিরচিত বলিয়া বিবেচনা করা হইত। চরকের ন্যায় সুশ্রুতের রচনাকাল সঠিক নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। বাগ্‌ভটও তাঁহার 'অষ্টাঙ্গহৃদয়' গ্রন্থে চরক ও সুশ্রুত হইতে অনেক অংশ অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহা হইতে অন্ততপক্ষে একথা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় যে খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর পূর্বেও সুশ্রুতের বর্তমান রূপ প্রচলিত ছিল। হিন্দুরা

যে গ্রীকদিগের নিকট সর্ব বিষয়ে ঋণী ইহা প্রমাণ করিবার চেষ্টায় হাস্ প্রমুখ কয়েকজন ইউরোপীয় পণ্ডিত সুশ্রুতকে আধুনিক বলিয়া দেখাইতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা স্বাভাবিক, কারণ ভারতের নিকট ঋণী একথা স্বীকার করিতে অধিকাংশ ইউরোপবাসীই লজ্জা অনুভব করেন। তাই তাঁহারা সাধারণত যেন-তেন-প্রকারেণ ভারতকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় ভারতকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে উত্থাপিত তাঁহাদের কোন যুক্তিই বিচারসহ নহে ; তাই তাঁহাদের সকল চেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইতে বাধ্য হইয়াছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে শল্যবিদ্যাই সুশ্রুতের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। ইহাতে ক্ষার পদার্থকে অস্ত্রের পর্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে। তীব্র ক্ষারের প্রয়োগে শরীরের রুগ্ন অংশ হইতে অস্ত্রোপচারের সাহায্য ছাড়াই চর্ম ও মাংস অপহৃত করিয়া পরিষ্কার করা যাইতে পারে। প্রকৃতিভেদে ক্ষারের দ্বারা তিন রকমের কাজ সাধিত হইতে পারে। কোন কোন স্থলে ক্ষার শীতলধর্মী, কোথাও বা প্রস্তুতপ্রণালীর বৈচিত্র্যে ইহা তিক্ত, উত্তপ্ত ও কটু হইতে পারে। ক্ষার পচনক্রিয়ার সহায়তা করে ও শরীরের রুগ্ন অংশের ধ্বংসসাধন করিতে পারে। দুরারোগ্য ক্ষত নিরাময় করিতে ইহার ক্ষমতা সর্ববাদিসম্মত। ইহাতে দানাবাঁধার সহায়তা করে, এবং ক্ষরণ-নিবারণ, রক্ত বন্ধ এবং চামড়া পরিষ্কার করা ইহার বিশিষ্ট ধর্ম। ক্ষারসেবন অম্ল, অজীর্ণ, ক্রিমি ও কফনাশক, ইহাতে চর্মরোগ, কতকগুলি বিষজনিত ব্যাধি ও স্থূলতা দূর হয়। অত্যধিক ক্ষারসেবনে পুরুষত্ব নষ্ট হয়।

সাধারণ উপকারিতাভেদে ক্ষার আবার দ্বিবিধ। এক প্রকার ক্ষার শুধু শরীরের বহির্ভাগে প্রয়োগ এবং অন্যপ্রকার সেবনকার্যে ব্যবহার করা হয়। কুষ্ঠ, দাদ, ফোড়া, দুরারোগ্য ক্ষত, ক্ষতনালী, আঁচিল, মুখের দাগ, শরীরের স্ফীতি, অর্শ, ভগন্দর প্রভৃতি রোগে ক্ষারের বাহ্যপ্রয়োগবিধি দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত উপজিহ্বা, আদিজিহ্বা, উপকুশ, দন্তবৈদর্ভ প্রভৃতি মুখের রোগে

এবং তিন প্রকার গলরোগে ইহার বাহ্যপ্রয়োগ অতিশয় ফলপ্রদ। মৃদু বিষ-ক্রিয়ায় (slow poisoning), অন্ত্রের ফোড়ায়, ক্ষুধামান্দ্যে, অজীর্ণে, অরুচিতে, কানপাকায়, মূত্রদোষে, অর্শে, ক্রিমিরোগে, শরীরের কোন অংশে স্ফীতিজনিত দুঃসহ ব্যথায় ক্ষারসেবন বিহিত আছে। শিশু, বৃদ্ধ ও রক্তমোক্ষিত রোগীর ক্ষারপ্রয়োগ প্রশস্ত নহে।

সাধারণ কদলী প্রভৃতি উদ্ভিদের ভস্মকে গোমূত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া ক্ষার প্রস্তুত করা হয়। কার্যশক্তি অনুসারে ক্ষারকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়,—মৃদু, মধ্যম এবং তীব্র।

ক্ষার তৈয়ারি করিতে ইচ্ছা করিলে শরৎকালে খুব শুভ একটি দিন বাছিয়া লইতে হইবে। অনাহারী থাকিয়া শুদ্ধদেহে কোন পাহাড়ের বিশেষ স্থানে জাত কাল ফুলযুক্ত একটি মধ্যম অথবা বড় "ঘণ্টাপাটলি" বৃক্ষকে উল্লেখ করিয়া নির্দিষ্ট মন্ত্রপাঠ করিতে হইবে। এই প্রক্রিয়াকে অধিবাস বলে। পরের দিন নিম্নোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে গাছটিকে কাটিয়া ফেলিতে হইবে,—"হে প্রচণ্ড শক্তিশালী গাছ, তোমার শক্তি যেন চিরকাল অব্যাহত থাকে, তুমি এই স্থানে অধিষ্ঠিত থাকিয়া আমার উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা কর। আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া তুমি স্বর্গে গমন কর।" ইহার পরে হোম-উৎসব প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। বাতাসশূন্য একটি স্থানে গাছটিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া স্তূপ প্রস্তুত করিতে হইবে। তারপর সেই স্তূপের উপরে কিছু চুনাপাথর (ঝিনুক) রাখিয়া উহাতে অগ্নি সংযোগ করিতে হয়। অগ্নি নির্বাপিত হইলে ঘণ্টাপাটলি-ভস্ম ও চুন-ভস্মকে পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে। নিম্নলিখিত বৃক্ষগুলিকেও ক্ষারপ্রস্তুত কাজের জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে—

কূটজ	অর্ক	চিত্রক	সপ্তচ্ছদ
পলাশ	স্নুহী	পূতিক	অগ্নিমন্থ
অশ্বকর্ণ	অপামার্গ	ইন্দ্রবৃক্ষ	গুঞ্জা
পারিভদ্রক	পাটলী	আস্ফোট	চতুর্বিধ কোষ

বিভীতক	নক্তমাল	অশ্বমারক
আরগ্বধ	বৃষ	
তিল্বক	কদলী	

প্রস্তুত-প্রণালীঃ—৩২ সের ক্ষারের সহিত ইহার ছয় গুণ জল অথবা গোমূত্র মিশ্রিত করিয়া কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে। একশ বার এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে। এইরূপে শোধিত তরল পদার্থকে অতঃপর ধীরে ধীরে একটি বড় কড়াতে জ্বাল দিতে হইবে এবং একখানি হাতল দিয়া অনবরত নাড়িতে হইবে। তরল পদার্থটি পরিষ্কার, কটু ও পিচ্ছিল হইলেই চুল্লির উপর হইতে ইহাকে নামাইতে হইবে এবং আর একবার কাপড় দিয়া ছাঁকিতে হইবে। ছাঁকিয়া যে তরল পদার্থ পাওয়া যাইবে তাহাকে আবার জ্বাল দিয়া ঘন করিলে আদর্শ ক্ষার প্রস্তুত হয়।

রক্ষণ-প্রণালীঃ—ক্ষার প্রস্তুত করিয়া লোহার পাত্রে ঢালিতে হয়। তারপর পাত্রের মুখ ভালভাবে বন্ধ করিয়া নির্জন স্থানে রাখিয়া দিতে হয়। মৃদু ক্ষারকে নিম্নলিখিত জিনিসগুলির প্রত্যেকটির ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া জ্বাল দিলে তীব্রক্ষারে পরিণত হয়।

দন্তী	চিত্রক	পূতিক	ক্ষীরী
দ্রবন্তী	লাঙ্গলিকী	কনক	বচা

সীসক ও রাংকে ক্রিমিনাশক ঔষধি বলে। পরবর্তী যুগের চিকিৎসকগণও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। রাংচূর্ণকে সাতদিন দধিসারের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঔষধ হিসাবে সেবন করিবার ব্যবস্থা সুশ্রুতে আছে।

চরক ও সুশ্রুতসংহিতার পরই ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাশাস্ত্র—বাগ্‌ভটের 'অষ্টাঙ্গহৃদয়'। দক্ষিণাপথে চরক ও সুশ্রুত অপেক্ষা বাগ্‌ভটের উল্লেখ বেশী দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া হাস্ প্রমুখ পণ্ডিতগণ বাগ্‌ভটকে চরক ও সুশ্রুতের উৎস বলিয়া মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু 'অষ্টাঙ্গহৃদয়' চরক ও সুশ্রুতসংহিতার সার-সংকলন মাত্র। একমাত্র শল্যচিকিৎসা অধ্যায়ে বাগ্‌ভটে

খানিকটা নূতনত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। ধাতু ও প্রকৃতিজাত বিভিন্ন পদার্থ ঔষধ হিসাবে ব্যবহারের উল্লেখ বাগ্‌ভটে আছে। পারদঘটিত ঔষধের কথাও বাগ্‌ভটে লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা এমন অস্পষ্ট যে বাস্তবিক কোন্ কোন্ পারদঘটিত যৌগিক ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইত অথবা মোটেই ব্যবহৃত হইত কিনা সে সম্বন্ধে কিছু বুঝিবার উপায় নাই। ধাতু ও ধাতুযৌগিক হিসাবে 'অষ্টাঙ্গে' যে উল্লেখ আছে তাহা লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় বাগ্‌ভটের অনেক পূর্বেই ধাতু-নিষ্কাশন-বিদ্যা ভারতে সুপ্রচলিত ছিল। বাগ্‌ভটের কয়েকটি শ্লোকের মর্মার্থ এখানে উল্লেখ করি—

"স্বর্ণ, তাম্র, রৌপ্য, লৌহ অথবা রাং, সৈন্ধব লবণ, মধু, হরীতকী সহ সেব্য।"

"স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও লৌহ দুগ্ধ এবং শিলাজতু সহ গ্রহণীয়।"

"৬৪ ভাগ স্রোতোঞ্জন (sulphide of antimony) তাম্র, লৌহ, রৌপ্য এবং স্বর্ণের প্রত্যেকটির একভাগ সহ একটি ঢাকা পাত্রে ভস্ম কর, ইত্যাদি।"

"৩০ ভাগ সীসক, ৫ ভাগ গন্ধক, তাম্র এবং হরিতালের প্রত্যেকটি ২ ভাগ, এক ভাগ রাং এবং তিন ভাগ স্রোতোঞ্জন লইয়া একটি রুদ্ধ পাত্রে ভস্ম কর।"

পারদ সম্বন্ধে বাগ্‌ভটে নিম্নলিখিত উদাহরণটিই বোধ হয় একমাত্র উল্লেখ—

"সমপরিমাণ পারদ এবং সীসক লইয়া একটি উত্তম মিশ্রণ প্রস্তুত করিতে হইবে। উহাতে সমান ওজনের স্রোতাঞ্জন ও কর্পূর মিশাইতে হইবে।··· ইত্যাদি।"

দক্ষিণ ভারতে কিংবদন্তি প্রচলিত আছে যে বাগ্‌ভট জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন কিন্তু জনৈক বৌদ্ধ শ্রমণের প্রভাবে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। 'অষ্টাঙ্গহৃদয়ে'র প্রথম শ্লোকটি লক্ষ করিলে মনে হয় যে ইহাতে বুদ্ধদেবকে অথবা বৌদ্ধধর্মের কোন বিশিষ্ট প্রতীককে প্রণতিজ্ঞাপন করা হইয়াছে। নানাসূত্রে সংগৃহীত প্রমাণ হইতে একমাত্র এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় যে বাগ্‌ভট খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে তাঁহার এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। অবশ্য প্রসিদ্ধ প্রাচ্য-তত্ত্ববিদ্ কুন্তের (Kunte) মতে, বাগ্‌ভটের রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী

ক্রান্তিকাল

৮০০-১১০০ খ্রীষ্টাব্দ

এ যুগের আয়ুর্বেদশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থকার বৃন্দ ও চক্রপাণি। বাগ্‌ভটের পরবর্তী যুগে ভারতবর্ষে ধাতব ঔষধসমূহের ব্যবহার ক্রমশই বিস্তৃতি লাভ করিতেছিল, এবং তাহার ফলে বনৌষধির উপর নির্ভরও ধীরে ধীরে কমিয়া আসিতেছিল। চক্রপাণি দত্ত এবং তৎপূর্ববর্তী গ্রন্থকর্তা বৃন্দের সময়ে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ধাতুঘটিত যৌগিক ব্যবহার পরিপূর্ণরূপেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে খ্রীষ্টীয় দশম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী কালে রচিত আয়ুর্বেদ গ্রন্থের প্রত্যেকখানিতেই ধাতুঘটিত ঔষধগুলির ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এইখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সুশ্রুতে ঔষধ প্রস্তুত বিধির যে বিবরণ দেওয়া আছে পরবর্তী যুগের কোন চিকিৎসাবিজ্ঞানই তদপেক্ষা উন্নততর বিধি উল্লেখ করিতে সমর্থ হয় নাই।

বৃন্দ এবং চক্রপাণির কালনির্দেশ চরক ও সুশ্রুতের কালনির্দেশ অপেক্ষা অনেকটা সহজ। চক্রপাণি গৌড়াধিপতি নয়পালের রাজবৈদ্য নারায়ণের পুত্র। নয়পাল ১০৪০ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়ের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।[১] চক্রপাণি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন কিন্তু বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁহার গভীর আস্থা ও প্রগাঢ় শ্রদ্ধা বিদ্যমান ছিল। আত্মপরিচয়ের সূত্রে চক্রপাণি তদীয় গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন,—

গৌড়াধিনাথরসবত্যাধিকারিপাত্র
নারায়ণস্য তনয়ঃ সুনয়োঽন্তরঙ্গাৎ।
ভানোরনু প্রথিতলোধ্রবলীকুলীনঃ
শ্রীচক্রপাণিরিহ কর্তৃপদাধিকারী।

---

১ নয়পালের যুগ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পুস্তিকাসমূহ দেখিতে হইবে—

(1) Cunningham's *Archælogical Survey of India*, III. p. 119. (2) Journ. As Soc. LX, Pt. 1. p. 46. (3) *Life of Atisa* by S. C. *Dasa*

অর্থাৎ, "লোধ্রবলী-বংশোদ্ভব, ভানুর কনিষ্ঠ, গৌড়াধিপতির পাকশালার অধ্যক্ষ নারায়ণের পুত্র শ্রীচক্রপাণি কর্তৃক এই গ্রন্থ বিরচিত।"

বৃন্দ এবং চক্রপাণি উভয়েই নাগার্জুনের প্রতিভাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং মুখ্যত চরক, সুশ্রুত ও বাগ্‌ভটের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া গেলেও তন্ত্রোক্ত ঔষধ ও তাহাদের ব্যবহারবিধি উভয়কেই প্রভাবান্বিত করিয়াছে। বস্তুত তাঁহারা ঔষধের কৃতকার্যতাবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অনেকক্ষেত্রে তন্ত্রসুলভ মন্ত্রোচ্চারণবিধি পর্যন্ত অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন।[১০]

বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ ও সেবার ধর্ম। মানব ও জীবজন্তু সকলেরই আধিব্যাধি-মোচনের চেষ্টা প্রত্যেক বৌদ্ধের অবশ্য-কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হয়। বৌদ্ধ-যুগে এই উদ্দেশ্যে দেশের সর্বত্র বৌদ্ধবিহারের সঙ্গে সঙ্গে মানব ও পশু-চিকিৎসার জন্য দাতব্য প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছিল। যে সকল রুগ্ন ব্যক্তি এই সমস্ত চিকিৎসালয়ে আসিতে পারিবে না তাহাদের কথাও বৌদ্ধগণের পক্ষে ভুলিয়া যাওয়া সম্ভব ছিল না। যাহাতে তাহাদের চিকিৎসার কোন ব্যাঘাত না হয় তদুদ্দেশ্যে জনাকীর্ণ নগরপ্রান্তে স্তম্ভ উত্তোলন করিয়া তাহার গাত্রে বিভিন্ন ব্যাধির ঔষধ প্রস্তুতপ্রণালী ক্ষোদিত করিয়া দেওয়া হইত। "নাগার্জুনেন লিখিতা স্তম্ভে পাটলিপুত্রকে" একটি ঔষধের প্রস্তুতি ও ব্যবহার-বিধি বৃন্দ এবং চক্রপাণি উভয়েই সংকলন করিয়া দিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় বৌদ্ধযুগের শ্রেষ্ঠ রাসায়নিক নাগার্জুন বৃন্দ এবং চক্রপাণি উভয়েরই পূর্ববর্তী।

---

১০ অয়ং মন্ত্রঃ প্রযোক্তব্যো ভিষজা চাভিমন্ত্রণে ॥
ওঁনমো বিনায়কায় অমৃতং রক্ষ রক্ষ মম ফলসিদ্ধিং
দেহি দেহি রুদ্রবচনেন স্বাহা ।১৭। বৃন্দরসায়নাধিকারঃ।' Poona Edition, p. 518,
ইদমিহ দৃষ্টোপকরণমেতদ্দৃষ্টস্তম্ভমন্ত্রেণ।
স্বাহান্তেন বিমর্দো ভবতি ফড়ন্তেন লোহবলরক্ষা।
সনমস্কারেণ বলির্ভক্ষণময়সো হুমন্তেন ॥
'ওঁ অমৃতোদ্‌ভবায় স্বাহা।' 'ওঁ অমৃতে হুং ফট্।'
'ওঁ নমশ্চণ্ডবজ্রপাণয়ে মহাযক্ষসেনাধিপতয়ে সুরগুরুবিদ্যামহাবলায় স্বাহা'। 'ওঁ অমৃতে হুং।'
ইতি চক্রপাণিরসায়নাধিকারঃ।

চক্রপাণি বৃন্দলিখিত 'সিদ্ধিযোগ'কে অনুসরণ করিয়া নিজগ্রন্থ রচনা করেন। বৃন্দ আবার মাধবকরের 'নিদান' গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া 'সিদ্ধিযোগ' প্রণয়ন করিয়াছিলেন। "বৃন্দেন***সংলিখ্যতে গদবিনিশ্চয়জক্রমেণ" ইত্যাদি উক্তি করিয়া বৃন্দ নিজেই তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

এই সকল প্রমাণ হইতে মনে হয় বৃন্দ চক্রপাণির এক বা দুই শতাব্দী পূর্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারও অনুরূপ সময় পূর্বে মাধবকরের 'নিদান' হিন্দুগণের মধ্যে একখানি অতিপ্রসিদ্ধ চিকিৎসাশাস্ত্রের গ্রন্থ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। এইভাবে 'নিদানে'র রচনাকাল অষ্টম শতকে আসিয়া দাঁড়ায়। মুসলমান খলিফাগণের আদেশে এই 'নিদানে'র একটি অনুবাদ আরবী ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

বৃন্দব্যবহৃত তাম্রপর্পটি প্রস্তুতবিধি নিম্নে লিখিত হইল—"গন্ধক, তাম্র এবং মক্ষি (pyrites) একত্র চূর্ণ করিয়া পারদের সহিত মিশ্রিত করিতে হইবে। অতঃপর অন্ধভূষা প্রথায় (ঢাকামুখ পাত্রে) ইহাকে ভস্ম করিয়া মধু সহযোগে সেবন করিতে হইবে।"

"একভাগ গন্ধক ও তাহার অর্ধেক পারদ লইয়া উত্তমভাবে মিশ্রিত কর। অতঃপর মধু ও ননী সহযোগে ইহা সেব্য। এই ঔষধের নাম 'রসামৃতচূর্ণ'।"

"ধুতুরা-রসের সহিত পারদ উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে উকুন মরিয়া যায়।"

চক্রপাণি হইতেও দুই একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। "রস-পর্পটিকা খ্যাতা নিবদ্ধা চক্রপাণিনা" বলিয়া ভূমিকা করিয়া চক্রপাণি বলেন, "একভাগ পারদের সহিত একভাগ গন্ধক উত্তমরূপে মর্দন করিলে কজ্জলী অথবা রসপর্পটির উদ্ভব হয়।" বৃন্দও অবশ্য ইহার ব্যবহার নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। পারদের শোধনপ্রণালী সম্বন্ধে চক্রপাণি সুবিস্তৃত উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তাম্র-যৌগিকের চূর্ণ চক্রপাণি 'তাম্রযোগ' পর্যায়ে লিপিবদ্ধ

করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, "অতি পাতলা নেপালী তাম্রের পাত লইয়া তাহাকে গন্ধকচূর্ণ দ্বারা উত্তমরূপে আচ্ছাদিত কর। অতঃপর ইহাকে একটি বাটির ন্যায় পাত্রে রাখিয়া অনুরূপ আর একটি পাত্র দ্বারা ঢাকিয়া দাও। উভয় পাত্রের সংযোগস্থল চিনি অথবা চাউলের গুঁড়া দিয়া বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। অতঃপর ইহাকে তিন ঘণ্টা বালির খোলায় উত্তপ্ত করিয়া লইলে 'তাম্রযোগ' প্রস্তুত হয়। ইহাকে চূর্ণ করিয়া অন্যান্য ঔষধের সহিত সেবন করিতে হইবে।"

এই যুগে (একাদশ শতাব্দীতে) হিন্দুদিগের আলকিমির (Alchemi) জ্ঞান কতটা ছিল ইহা জানিতে স্বভাবতই কৌতূহল জন্মে। এ সম্বন্ধে আলবেরুনি বলেন, "পৃথিবীর কোন জাতিই আলকিমির প্রভাব হইতে একেবারে মুক্ত নহে। কেহবা ইহাকে অল্প আবার কেহবা ইহাকে অধিক পরিমাণে অনুশীলন করে মাত্র। আলকিমির অনুসরণ দেখিয়া কোন জাতির বুদ্ধিমত্তা অথবা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় পাওয়া যায় না। বহু বুদ্ধিমান ব্যক্তি আলকিমির চর্চা করেন আবার অনেক অল্পবুদ্ধি লোকও আলকিমির অনুশীলনকারিগণকে উপহাস করিয়া থাকেন। এই সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা তাঁহাদের মনগড়া বিজ্ঞান সম্বন্ধে অতিশয় উৎসাহী। কিন্তু তাঁহাদিগকে বড় বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না, কারণ দুর্ভাগ্যকে দূর করিয়া ভাগ্য অনুসন্ধান করিতে তাঁহারা অতিরিক্ত মাত্রায় আগ্রহান্বিত বলিয়াই এইরূপ করিয়া থাকেন। একদা এক সাধুকে প্রশ্ন করা হইল যে, 'ধনীরা যখন পণ্ডিতের গৃহে পদার্পণ করিতে চায় না তখন পণ্ডিতেরাই বা কেন ধনীর গৃহে উপস্থিত হইয়া জনতার সৃষ্টি করেন?' সাধুটি ইহার উত্তরে বলেন, 'ইহার কারণ পণ্ডিতেরা ধনের ব্যবহার বিশেষ রূপে জ্ঞাত আছেন কিন্তু ধনীরা বিজ্ঞানের মর্যাদা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।' অন্যদিকে আলকিমির প্রতি বীতশ্রদ্ধ বলিয়াই অজ্ঞলোকদিগের প্রশংসা করা যায় না, কারণ তাহাদের উদ্দেশ্যও নিন্দার ঊর্ধ্বে নহে। অন্য কোন কারণে না হইলেও কেবলমাত্র মূঢ়তা ও অজ্ঞতার জন্যই তাহারা আলকিমির প্রতি বীতশ্রদ্ধ।

"হিন্দুগণ এই আলকিমি সম্বন্ধে অসম্ভব রকম উৎসাহী নন। আলকিমির অনুরাগীরা কিন্তু এ সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য গোপন রাখিতে প্রয়াস পান এবং নিজ সম্প্রদায়ের লোক ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত ইহার আলোচনায় পর্যন্ত সংকুচিত হন। এইজন্য আমি হিন্দুদিগের নিকট হইতে এই শাস্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ কোন জ্ঞান সঞ্চয় করিতে পারি নাই। আলকিমি চর্চায় তাঁহারা কি প্রথা অবলম্বন করেন, কোন্ ধাতু সাধারণত তাঁহারা গ্রহণ করেন, ধাতব, জান্তব অথবা ভেষজ কোন্ পদার্থ ব্যবহার করেন আমি তাহার কিছুই জানিতে পারি নাই। কেবল নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রক্রিয়ার নাম তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি মাত্র। এগুলি হইল উর্ধ্বপাতন, ভস্মীকরণ এবং বিশ্লেষণ * * আমার মনে হয়, এ ব্যাপারে তাঁহারা ধাতুর ব্যবহারমূলক প্রক্রিয়াগুলিই অধিকতর পছন্দ করেন।

"আলকিমির অনুরূপ তাঁহাদের আর একটি নিজস্ব বিশেষ শাস্ত্র আছে, ইহাকে বলা হয় রসায়ন। এই শাস্ত্র 'রস' অথবা স্বর্ণ সম্পর্কিত। এই রসায়ন বলিতে আমরা বুঝি কতকগুলি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া এবং উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতে প্রাপ্ত কতকগুলি মৌলিক ও মিশ্রিত ঔষধ। যাহাদের রোগ নিরাময় হইবার কোন আশাই নাই তাহাদের স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার করা, যাহারা বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহাদিগকে নবীন যৌবন দান করাই ইহার উদ্দেশ্য।"

সুশ্রুতের 'রসক্রিয়া' শব্দের অর্থ 'ঘন ক্বাথ'। ইহার পরবর্তী যুগে যখন কেবল উদ্ভিজ্জ ঔষধের পরিবর্তে পারদ ও অন্যান্য ধাতুঘটিত ঔষধের প্রচলন আরম্ভ হইল তখন শরীরস্থ রসের উপর পারদের আশ্চর্য শক্তি দেখিয়া পারদের নাম 'রস' রাখা হইল। প্রাচীন গ্রন্থসমূহে রসায়ন শব্দের অর্থ বার্ধক্যনিবারক ও আয়ুর্বর্ধক ঔষধ। ক্রমশ কেবলমাত্র পারদ ও ধাতুসঞ্জাত আয়ুর্বর্ধক ঔষধকেই রসায়ন বলিয়া অভিহিত করিবার প্রথা বিস্তৃতি লাভ করিল।

৪৩৬(১২)

SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE
BANIPUR

তান্ত্রিক যুগ

১১০০-১৩০০ খ্রীষ্টাব্দ

হিন্দু-রসায়নের ইতিহাসে তন্ত্রের অবদান অসামান্য। ভারতীয় আলকিমির উদ্ভব এবং স্বরূপ তান্ত্রিক সাধনার সহিত ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। প্রাচীন হিন্দুগণের রসায়নের জ্ঞান সম্বন্ধে যাঁহারা কোন ধারণা লাভ করিতে চাহেন, 'রসার্ণব', 'রসহৃদয়', নাগার্জুন লিখিত 'রসরত্নাকর' এবং 'রসসারে' বর্ণিত রাসায়নিক প্রক্রিয়াসমূহ যথাযথরূপে পরীক্ষা করা তাঁহাদের একান্ত কর্তব্য। তান্ত্রিক সাধনার অতি গৌরবময় যুগেই এই সকল গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল, সুতরাং তান্ত্রিক সাধনার ইতিহাস সম্পর্কে দুই একটি কথার অবতারণা করা এখানে নিতান্ত প্রয়োজন।

জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যামিতি এবং শারীরস্থান (Anatomy) সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই বলা চলে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে অথর্ববেদ প্রধানত ইন্দ্রজাল, যাদুবিদ্যা এবং পিশাচতত্ত্ব লইয়াই অধিকতর চর্চা করিয়াছে। এই কারণে অথর্ববেদকে সাধারণত অন্যান্য বেদ অপেক্ষা আধুনিক বলিয়া বিবেচনা করা হয়। সম্ভবত এ ধারণা ভুল। সিদ্ধিলাভের উদ্দেশ্যে জপতপ, ধ্যানধারণা, যাগযজ্ঞের ব্যবস্থা সর্বসাধারণের জন্য নহে। আপামর জনসাধারণের পক্ষে এই প্রকার কষ্টার্জিত সিদ্ধি নিশ্চয়ই লোভনীয় হইতে পারে না। এই জন্যই তাহারা সিদ্ধির সহজতর পন্থা অনুসন্ধানের চেষ্টা করিয়াছে। এই অনুসন্ধানের ফলেই অথর্ববেদের উৎপত্তি।

বিজয়ী আর্যগণ যখন ভারতে বসতি বিস্তার আরম্ভ করিলেন, তখন নানা প্রকারে তাঁহারা বিজিত অনার্যগণের সংস্পর্শে আসিতে লাগিলেন ; ফলে অজ্ঞাতসারেই অনার্যসুলভ নানাপ্রকার কুসংস্কার তাঁহাদের মধ্যে সংক্রমিত হইতে

C865

লাগিল। কালক্রমে এই সকল কুসংস্কার পুঞ্জীভূত হইয়া বিশুদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞানকে পর্যন্ত গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। এই মনোবৃত্তিকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে মহাভারত ও অন্যান্য ব্যবহারশাস্ত্র অথর্ববেদকে অপাংক্তেয় করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু জনসাধারণের সরল বিশ্বাসের উপর ইহার ভিত্তি, এবং চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে ইহা প্রামাণিক বলিয়া এই গ্রন্থকে কোন দিনই অপাংক্তেয় করা সম্ভবপর হয় নাই। সংস্কৃত সাহিত্যে যখনই ইন্দ্রজাল বা যাদুবিদ্যা সম্পর্কে কোন উল্লেখ করিতে হইয়াছে তখনই অথর্ববেদ হইতে প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করিতে হইয়াছে। পরবর্তী যুগে যখন হিন্দুগণের মধ্যে শিবপূজার প্রচলন হইয়াছিল তখন অনার্যগণ কর্তৃক অবলম্বিত অনেক প্রক্রিয়া এবং অথর্ববেদের অনেক ব্যবস্থা প্রয়োজনানুসারে ঈষৎ সংস্কৃত অবস্থায় হিন্দুসমাজে বিস্তৃতি লাভ করিল।

সপ্তম শতাব্দীতেই শিবপূজা ভারতবর্ষে দৃঢ়প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। বাণ-রচিত হর্ষচরিতে ভৈরবাচার্য নামক জনৈক শৈব সন্ন্যাসী কর্তৃক শিব আরাধনার একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। "একটি রক্তাম্বরপরিহিত, রক্তচন্দনচর্চিত এবং মাল্যভূষিত মৃতদেহকে চিত অবস্থায় শায়িত করিয়া তাহার বুকের উপর কাল পোশাক, কাল শীর্ষাভরণ ও কাল কবচ পরিহিত ভস্মবিভূষিত জনৈক সাধক জ্বলন্ত মশাল শবের মুখে প্রবেশ করাইয়া দিলেন…ইত্যাদি।" ভবভূতি (৬৯০ খ্রীষ্টাব্দ) মালতীমাধব নাটকেও অনুরূপ বর্ণনা দিয়াছেন।

ইহাই হইল তান্ত্রিক সাধনার আদিম ইতিহাস। শিব এবং পার্বতীর পূজাকে কেন্দ্র করিয়া যে সমস্ত অমার্জিত এবং রুচিবিগর্হিত প্রথা ভারতে ক্রমশ প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল তাহার সহিত আলকিমিচর্চার একটি অদ্ভুত সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। অথর্ববেদোক্ত ধর্মানুষ্ঠান এবং তান্ত্রিক সাধনা প্রায় একই ধারায় বর্ধিত হইয়াছে। জনগণের অপেক্ষাকৃত অমার্জিত রুচি এবং নিকৃষ্টতর প্রবৃত্তির উপর ভিত্তি করিয়াই উভয়ের প্রচলন ও প্রসার সম্ভব হইয়াছে।

তন্ত্রকে প্রধানত ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। উভয় প্রকার তন্ত্রেরই আলোচ্য বিষয় এক—ইন্দ্রজাল, প্রেততত্ত্ব ইত্যাদি। যে সকল কারণে হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্রের প্রচলন ও প্রসার সম্ভব হইয়াছে ঠিক সেই সেই কারণেই বৌদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্রসমূহও প্রচারিত হইয়াছে বলিতে পারা যায়। বৈষম্যের মধ্যে মাত্র এইটুকু লক্ষ্য করা যায় যে হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্রে যেখানে শিব ও পার্বতীকে সর্বপ্রকার জ্ঞানের উৎস বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে বৌদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্রে সেখানে একজন বুদ্ধ, তথাগত অথবা অবলোকিতেশ্বরের অবতারণা করা হইয়াছে মাত্র। 'মহাকালতন্ত্রে' অথবা নাগার্জুন বিরচিত 'রসরত্নাকরতন্ত্রে' আবার হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় মতের সংমিশ্রণ হইয়াছে। 'রসরত্নাকর' এবং শৈব তন্ত্রশাস্ত্রের 'রসার্ণব' গ্রন্থে প্রাচীন ভারতের রাসায়নিক জ্ঞানের অগণিত প্রমাণ বিদ্যমান।

বৌদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্রের উদ্ভব সম্বন্ধেও একটি সাধারণ আলোচনা এখানে করা যাইতে পারে। বৌদ্ধধর্মাবলম্বিগণ কোন্ কোন্ কারণে এবং কোন্ সময় তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা সঠিকভাবে বলা প্রায় অসম্ভব। হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্রের সহিত বৌদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্রসমূহের সাদৃশ্য সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে—উভয় শাস্ত্র একত্রে পাঠ করিলে স্বভাবতই মনে হয় উভয়েরই মূল এক।

বৌদ্ধ ধর্ম সেবার ধর্ম ; কিন্তু গৌতম বুদ্ধের মহাপ্রয়াণের পর এই ধর্মের অনুবর্তীদের মধ্যে মতবিরোধ ধীরে ধীরে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছিল। কাল-ক্রমে বৌদ্ধগণের মধ্যে মহাযান ও হীনযানবাদী নামে বিশিষ্ট দুইটি সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব প্রকট হইয়া উঠে। মাধ্যমিক ন্যায়শাস্ত্রের প্রবর্তক নাগার্জুন এই মহাযানপন্থীদিগের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ এবং ভারতীয় রসায়নশাস্ত্রের যুগপ্রবর্তক।

মহারাজ অশোক-শাসিত ভারতবর্ষ (খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক) মুখ্যত বৌদ্ধধর্মের অনুবর্তী লইলেও হিন্দুমতবাদ এযুগে একেবারেই প্রচলিত ছিল না এরূপ মনে করিবার কোন সংগত কারণ নাই। এ সময় বৌদ্ধধর্ম বিশেষ

প্রচলিত ছিল মাত্র ইহাই বলা যাইতে পারে। বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রাধান্যের মূলে ছিল ইহার মহান উদারতা। বৌদ্ধধর্মমত সর্বাংশে হিন্দুমত-নিরপেক্ষ হইয়া গড়িয়া উঠে নাই, বরঞ্চ হিন্দুমতের যাহা সুন্দরতর অভিব্যক্তি বৌদ্ধমত তাহাকে নিঃশেষে নিজস্ব করিয়া লইয়াছিল বলিতে পারা যায়। প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধধর্মমত হিন্দুমতেরই স্বাভাবিক পরিণতি। ভারতবর্ষ যদি কোন দিন শাক্যমুনির মতবাদ গ্রহণ করিয়া থাকে তবে তাহা এই কারণে সম্ভব হইয়াছিল যে জনগণ কোন দিন বৌদ্ধধর্মকে হিন্দুধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া মনে করে নাই। হিন্দুধর্মের যাহা উৎকৃষ্ট, যাহা সুন্দর তাহার সবই বৌদ্ধধর্মমতে গ্রহণ করা হইয়াছিল বলিয়া জনসাধারণ স্বভাবতই উহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য কোন দিনই অস্ত্রবলের আবশ্যক হয় নাই, বরঞ্চ অশোক প্রভৃতি বিশিষ্ট বৌদ্ধ নরপতি সকলেই বিশেষভাবে পরমতসহিষ্ণু ছিলেন। বৌদ্ধ ও হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্রের উদ্ভব ও পরস্পর সম্বন্ধনির্ণয়ে এ কথা বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে উত্তর ভারতে কুষাণ নৃপতিবর্গ রাজত্ব করিতেছিলেন। কণিষ্ক এই কুষাণ নৃপতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি বৌদ্ধমতাবলম্বী, এবং তাঁহার রাজত্বকালে তাঁহার আহ্বানেই বৌদ্ধ ধর্মাচার্যগণের যে সভাধিবেশন হয় ইতিহাসে তাহা তৃতীয় ধর্মসংসদ (বৌদ্ধ) বলিয়া প্রখ্যাত। শ্রমণগণের মধ্যে ইতিমধ্যেই যে মতান্তর ও মনান্তর ক্রমশ তীব্রতর হইয়া উঠিতেছিল মহারাজ কণিষ্ক প্রধানত তাহারই সমাধানের উদ্দেশ্যে এই সংসদ আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহাতে সমস্যার সমাধান কিছু হইল না, মনান্তর দূর হইলেও মতান্তর পূর্বের ন্যায়ই রহিয়া গেল। কেবলমাত্র ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রসিদ্ধ স্থবিরবৃন্দ নব্যতন্ত্রবাদিগণের উদ্ভাবিত মহাযানমত বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রের অঙ্গীভূত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন।

এই তৃতীয় ধর্মসংসদের পর মহাযানবাদী ও হীনযানবাদিগণের মধ্যে বিরোধ প্রবলতর হইতে লাগিল। হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানের সূচনা ইহার

পূর্বেই হইয়াছিল এবং ইতিমধ্যেই হিন্দুধর্ম যথেষ্ট শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। স্থান কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া মহাযানবাদিগণ অনুবর্তীদিগের সংখ্যাবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে হিন্দুধর্মের সহিত কতকটা আপস করিয়া লইলেন।

"সর্বং শূন্যং" মতের পরিপোষক মাধ্যমিক দর্শনের উদ্ভাবক নাগার্জুন মহাযানবাদের প্রসারের জন্য বিশেষভাবে দায়ী। ভারতীয় রসায়নশাস্ত্র নাগার্জুনের নিকট প্রত্যক্ষত ঋণী। উত্তর ভারতের প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থসমূহ নাগার্জুন অনুষ্ঠিত বহু প্রকার যাদু ও ইন্দ্রজালের উল্লেখে পরিপূর্ণ। প্রসিদ্ধ চীনা পরিব্রাজক হিউএনৎসাঙ নাগার্জুনকে পৃথিবীর চতুঃসূর্যের অন্যতম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ৪০১ হইতে ৪০৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নাগার্জুন কর্তৃক বোধিসত্ত্বের একখানি জীবনী চীনাভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। পরবর্তীকালে তারানাথ তিব্বতীয় ভাষায় নাগার্জুনের যে জীবনী লিখিয়াছিলেন তাহার মধ্যে অবিশ্বাস্য কথা অনেক বর্তমান। তবে সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া এবং সকল তথ্য বিচার করিয়া মনে হয় নাগার্জুন ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং যথারীতি হিন্দুমতানুযায়ী শিক্ষালাভ করিলেও ক্রমশ বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হন।

তন্ত্রশাস্ত্রগুলি প্রাচীন ভারতের রাসায়নিক জ্ঞানের আকর; পারদ সম্পর্কে এই গ্রন্থগুলি বিশেষরূপে মুখর বলিয়া এগুলিকে বোধ হয় সুদূর অতীতে পারদই বলা হইত। 'রসার্ণব' তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"বিশিষ্ট সাধকেরা জীবনের সর্বোচ্চ কামনাপূরণে ইহার ব্যবহার করেন বলিয়া ইহার নাম পারদ।"

"আমার অঙ্গ হইতে ইহার উৎপত্তি, হে দেবী, ইহা আমারই সমান। আমার দেহের ইহা ধর্ম, সুতরাং ইহাকে বলে রস।"

"ষড়্‌দর্শনের মতে দেহের মৃত্যুর পর মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে, কিন্তু এরূপ মোক্ষ করতলন্যস্ত আমলকীবৎ অনুভূত হয় না। সুতরাং পারদ ও ঔষধাদির দ্বারা দেহকে রক্ষা করা কর্তব্য।"

'রসহৃদয়' নামক আর একখানি প্রাচীন তন্ত্রগ্রন্থেও পারদ হইতে প্রস্তুত ঔষধসমূহের গুণের ভূয়সী প্রশংসা দৃষ্ট হয়। যথা—

"যাঁহারা হর (পারদ) ও গৌরীর (অভ্র) কৃপায় নিজ নিজ দেহ ত্যাগ না করিয়াও নূতন নূতন শরীর লাভ করিয়াছেন তাঁহারা রসসিদ্ধ পুরুষ। সকল মন্ত্রই তাঁহাদের করতলগত।"[১১]

"যে যোগী জীবিতাবস্থায় মোক্ষলাভ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তিনি প্রথমে নিজের দেহকে সমর্থ রাখিতে এবং উন্নত করিতে অবশ্যই চেষ্টা করিবেন। হর হইতে পারদ এবং গৌরী হইতে অভ্র উৎপন্ন। এই নিমিত্ত হর ও পারদ একার্থবোধক, গৌরী ও অভ্রও সেইরূপ।" এ সম্বন্ধে একটি শ্লোকের অর্থ এই প্রকার—

"অভ্র তোমার বীজ, এবং পারদ আমার বীজ। এই দুইটির সংমিশ্রণে যে পদার্থের উদ্ভব হয় তাহা মৃত্যু এবং দারিদ্র্য নাশ করিতে সমর্থ।" (পার্বতীর প্রতি হরের উক্তি)।

প্রাচীন ভারতে রাসায়নিক জ্ঞান সম্বলিত তন্ত্রসমূহের প্রয়োজনীয়তা এতই অধিক অনুভূত হইয়াছিল যে পারদ সম্বন্ধে একটি সম্পূর্ণ নূতন দর্শনশাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল। মাধবাচার্য প্রণীত 'সর্বদর্শনসংগ্রহে' এই দর্শন অতি উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছে। এই আদর্শ প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে এতদ্বিষয়ক একটি মত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—

ন চ রসশাস্ত্রং ধাতুবাদার্থমেবেতি মন্তব্যং মুক্তেরেব পরমপ্রয়োজনত্বাৎ

অর্থাৎ, "রসশাস্ত্র বলিতে কেবল যে রসায়নের একটি শাখাকে বুঝিতে হইবে তাহা নহে, পরন্তু পারদ হইতে প্রস্তুত ঔষধ সেবনে শরীরকে অমর করিয়া মুক্তিলাভের বিষয়ও রসশাস্ত্রের অঙ্গীভূত।"

রুদ্রযামল তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ধাতুক্রিয়া নামক গ্রন্থে 'রসায়নী বিদ্যা' (Chemistry) শব্দটি ইহার বর্তমান অর্থে ব্যবহৃত দেখিতে পাই। পারদ

---

১১ তন্ত্রশাস্ত্রে পারদ ও অভ্রকে হর এবং গৌরীর প্রতীক বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে।

হইতে নানাবিধ ঔষধ প্রস্তুত করিতে যে সমস্ত রাসায়নিক প্রক্রিয়া আবশ্যক তাহার ক্রমবিকাশই হিন্দু রসায়নের ইতিহাসের আলোচ্য বিষয়। কোন্ চিকিৎসা গ্রন্থে অথবা রাসায়নিক তন্ত্রে কিরূপ ভাবে পারদের ব্যবহারবিধি উল্লিখিত হইয়াছে তাহা দেখিয়া ঐ পুস্তক কোন্ সময়ে লিখিত তাহা নির্ধারণ করা যায়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে বৃন্দ আনুমানিক ৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ও চক্রপাণি তাহার পরে ঔষধার্থে পারদ ও তজ্জাত কজ্জলী ব্যবহারের বিধি দিয়াছেন। ইউরোপীয় রসায়নের ইতিহাস আলোচনা করিলে প্রতীয়মান হয় যে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে (চক্রপাণির অন্যূন ছয় শত বৎসর পরে) তুর্কে-দ্য-মেয়ার্ন এই বিখ্যাত ঔষধ প্রথম আবিষ্কার করেন। তিনি ইহাকে 'ইথিওপীয় খনিজ' বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীতে প্যারাসেলসস ইউরোপে প্রথম পারদঘটিত ঔষধের প্রচলন আরম্ভ করেন। প্যারিসের চিকিৎসকমণ্ডলী তৎকালে এই পারদঘটিত ঔষধসেবন নিষিদ্ধ করিয়া দেন। 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' প্রণেতা মাধবাচার্য ১৩৩১ খ্রীষ্টাব্দে শৃঙ্গেরী মঠের অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। বিজয়নগরাধিপতি প্রথম বুক্কের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন এই মাধবাচার্য। তাঁহার সম্পাদিত বিভিন্ন দর্শনের মধ্যে 'রসেশ্বরদর্শন' অন্যতম। এই 'রসেশ্বরদর্শনে' 'রসার্ণবে'র উল্লেখ আছে। ইহাতে মনে হয় অন্ততপক্ষে একাদশ অথবা দ্বাদশ শতাব্দীতে রসার্ণব প্রমুখ তন্ত্রশাস্ত্রের প্রচলন হয়। অবশ্য তন্ত্রশাস্ত্র যে তাহার পূর্বেও প্রচলিত ছিল না ইহা হইতে সেরূপ অনুমান করা যায় না। বস্তত-পক্ষে মাধবাচার্য রসার্ণব ও অন্যান্য তন্ত্রের উল্লেখ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে এই সকল তন্ত্রশাস্ত্র তাঁহার জীবনকালে প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া গণ্য হইত।

নবম শতাব্দীতে প্রচলিত বাণ এবং চীনা পরিব্রাজক ঈ-ৎসিঙ্ (I-Tsing) রচিত গ্রন্থাদিতে এমন কোন কিছু লিখিত নাই যাহা হইতে মনে হইতে পারে যে অন্তত পক্ষে সেই সময় হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্রে ধাতব পদার্থ, বিশেষ করিয়া পারদের ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ কোন উল্লেখ আছে। কিন্তু উল্লেখের অভাব

হইতে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নহে। ৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্তী কোন সময়ে বরাহমিহির প্রণীত 'বৃহৎসংহিতা'য় লৌহ এবং পারদের ব্যবহারের উল্লেখ রহিয়াছে।[১২]

মার্কো পোলো তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তের একস্থানে বলিয়াছেন, "আর একপ্রকার লোক আছে যাহাদিগকে বলা হয় 'যোগী'। যোগীরা আসলে অব্রাহ্মণ, কিন্তু তাহারা তাহাদের নিজস্ব পদ্ধতি অনুসারে মূর্তিপূজা করে। তাহারা অত্যন্ত দীর্ঘায়ু, প্রত্যেকেই দেড়শত হইতে দুইশত বৎসর পর্যন্ত বাঁচে। তাহারা অতিশয় স্বল্পাহারী * * * * এবং একপ্রকার উত্তেজক পানীয় ব্যবহার করিয়া থাকে। যোগীরা খানিকটা গন্ধক ও পারদ একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রতিমাসে দুইবার করিয়া সেবন করে। তাহাদের মতে ইহা দীর্ঘজীবন দান করে এবং বাল্যকাল হইতেই তাহারা ইহা সেবন করিয়া থাকে।"

অতীত ভারতে হিন্দু রাসায়নিকগণের জ্ঞান বাস্তবিক কতখানি গভীর ছিল তাহা নির্ণয় করিতে 'রসার্ণব' অমূল্য গ্রন্থ। তন্ত্রশাস্ত্রের অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় রসার্ণবও হরপার্বতীর কথোপকথনছলে লিখিত। রাসায়নিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত নানাপ্রকার যন্ত্রাদির মনোজ্ঞ বিবরণ রসার্ণবে প্রদত্ত হইয়াছে। দোলাযন্ত্র, গর্ভযন্ত্র, হংসপাকযন্ত্র প্রভৃতি বিবৃত করিতে গিয়া ভগবান ভৈরব প্রথমেই বলিয়াছেন, "রস, উপরস, ধাতু, একখণ্ড বস্ত্র, একজোড়া হাপর, লৌহ-যন্ত্রাদি, পাথরের খল ও পেষণযন্ত্র, একটি কোষ্ঠিযন্ত্র, একটি বাঁকনল * * * * কিছু গোময়, কাষ্ঠ, বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকানির্মিত যন্ত্র, এক জোড়া সাঁড়াশী, নানা ধরণের লৌহ এবং মৃৎপাত্র, তুলাদণ্ড ও ছোট বড় ওজন, বংশ এবং লৌহ-নল, চর্বি, অম্ল, লবণ, ক্ষার, বিষ—এই সমস্ত পদার্থ প্রথমে সংগ্রহ করিবে এবং অতঃপর রাসায়নিক প্রক্রিয়া আরম্ভ করিবে।"

---

[১২] মাক্ষিকধাতুমধুপারদলৌহচুর্ণ

পথ্যাশিলাজতুবিড়ঙ্গঘৃতানি যোঽষ্যাৎ। ইত্যাদি।

কোন ধাতুকে আগুনে ধরিলে যে রং দেখা যায় তাহা হইতে ঐ ধাতুটির স্বরূপ নির্ণয়ের উপায় ইহাতে বিবৃত আছে। একটি শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"আগুনে ধরিলে তাম্র নীল রঙের আলো দেয়, রাং পারাবতের দেহের রঙের ন্যায় এবং সীসক ফ্যাকাশে ধরণের আলো বিকিরণ করে।"

কোন ধাতু হস্তে ধারণ করিলে তজ্জন্য হস্তে যে বিশেষ গন্ধ হয় তাহা হইতে ধাতুটি কি তাহা জানা যায়। আধুনিক রসায়ন-গ্রন্থসমূহে এ বিষয়ে প্রায়ই কিছু লেখা নাই। এই স্থলে 'রসরত্নসমুচ্চয়' হইতে সীসক সম্বন্ধে একটি শ্লোকের অনুবাদ প্রদত্ত হইল,—"সীসক সহজেই গলিয়া যায়, ইহা অত্যন্ত ভারি, ভাঙ্গিলে উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ দেখায়, ইহা পূতিগন্ধবিশিষ্ট।"

প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ রাসায়নিক নাগার্জুন বৌদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্রসমূহের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সঠিকভাবে নাগার্জুনের সময় নির্ণয় দুরূহ ব্যাপার, তবে সাধারণতঃ তাঁহাকে কণিষ্কের সমসাময়িক বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে। লাসেনের মতে ২৩ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্তী কোন সময়ে নাগার্জুন জীবিত ছিলেন, মোটামুটিভাবে বলা যায়, আনুমানিক ১৫০ খ্রীষ্টাব্দে নাগার্জুন ভারতীয় রাসায়নিক সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন মনে করিলে কোন ভুল হইবে না।

নাগার্জুনের সময় হইতেই মহাযানবাদের মধ্য দিয়া ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্মের ক্রমশ সংমিশ্রণ ঘটিতে আরম্ভ হয়। গান্ধারবাসী শ্রমণ অসঙ্গ পতঞ্জলির মতবাদের উপর ভিত্তি করিয়া 'যোগাচার-ভূমিশাস্ত্র' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। বৌদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্রের পুষ্টিতে এই গ্রন্থ প্রভূত সাহায্য করিয়াছে। আনুমানিক ৪০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে অসঙ্গ জীবিত ছিলেন। অসঙ্গের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বসুবন্ধুও মহাযানবাদের একজন বিশিষ্ট সমর্থক। কথিত আছে তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন এবং সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক দিঙ্‌নাগ বসুবন্ধুর শিষ্য।

ইতিমধ্যেই মহাযানবাদ আপন পারিপার্শ্বিকের সহিত সামঞ্জস্য বিধানে সক্ষম

হইয়াছিল। হিন্দু যোগশাস্ত্রকে স্বীকার করিয়া লওয়ায় মহাযানবাদ ক্রমশই তন্ত্রশাস্ত্রের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল বলা যায়, শৈবগণের সহিত সামঞ্জস্য সাধন করিতে যাইয়া বৌদ্ধগণ দেবদেবীর অস্তিত্বকে পর্যন্ত স্বীকার করিয়া লইতে কুণ্ঠিত হন নাই। হিন্দুগণ প্রথম দিকে বৌদ্ধমতের প্রচারে যতই অস্বস্তি এবং উৎকণ্ঠা অনুভব করুন না কেন পরবর্তী কালে অবশ্য গৌতম বুদ্ধকে শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। 'গীতগোবিন্দে' জয়দেব বলিতেছেন—

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্
সদয়হৃদয়-দর্শিত-পশুঘাতম্
কেশবধৃত বুদ্ধশরীর
জয় জগদীশ হরে॥

ইহার পূর্বে না হইলেও, অন্তত পক্ষে পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শতাব্দীতে বৌদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্রসমূহ যে ভারতবর্ষে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। জাপানে অবস্থিত হোরিউজি (Horiuzi) মঠে সম্প্রতি কয়েক খণ্ড তালপাতার পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে একখানি কান-শিন (Kanshin) নামক চৈনিক সাধুর হস্তলিখিত বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। পুথিগুলি মধ্যভারত হইতে চীনে এবং চীন হইতে জাপানে গিয়াছিল। কান-শিন ৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে গিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। ইহা হইতে মনে হয় বৌদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্রসমূহ আপন জন্মভূমিতে অন্তত আরও দুই তিন শতাব্দী পূর্বেই স্থায়ী প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিল।

বৌদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্রগুলি ভারতবর্ষ হইতে চীন ও তিব্বতে গিয়া যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছিল। অমোঘবজ্র নামক উত্তর ভারতের জনৈক শ্রমণ ৭৪৬ হইতে ৭৭১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চীন দেশে বসবাস করেন। উত্তর এশিয়াতে তন্ত্র-শাস্ত্রের প্রচার এবং প্রসারে তিনি প্রভূত সাহায্য করেন। 'উষ্ণীষ-চক্রবর্তী তন্ত্র', 'গরুড়-গর্ভজ-তন্ত্র' এবং 'বজ্র কুমার তন্ত্র' প্রভৃতি মোট ৭৭ খানি তন্ত্র তিনি

অনুবাদ করেন। অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধে বঙ্গদেশ হইতে দুইজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতীয় নরপতির নিমন্ত্রণে তিব্বত ভ্রমণ করেন। ইহাদের একজন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাস্থবির শান্তি রক্ষিত অপর জন উদয়নবাসী পদ্মসম্ভব। ইহাদের পরে দীপংকর শ্রীজ্ঞান অতীশ তিব্বত গমন করেন। অতীশ নয়পালের অনুরোধে বিক্রমশিলার মঠাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রসিদ্ধ ডচ্ বৌদ্ধতত্ত্ববিশেষজ্ঞ কেয়ার্ন (Kern) তন্ত্রশাস্ত্রের উদ্ভব ও প্রসার সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু তিনি তন্ত্রের প্রসারকাল সম্বন্ধে যাহা বলেন তাহা সর্বাংশে যুক্তিসহ বলিয়া মনে হয় না। অষ্টম শতাব্দী অথবা তৎপরবর্তী কালে তন্ত্রের প্রচার হইয়াছিল বলিয়া তিনি মনে করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারও কয়েক শত বৎসর পূর্বেই ভারতে তন্ত্রসমূহ যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে। কেয়ার্নের মতের সারাংশ এইখানে উদ্ধৃত করা হইল,—"অষ্টম শতাব্দী এবং তৎপরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মের অবনতির সহিত তান্ত্রিক মতবাদ ও প্রেততত্ত্বের প্রসার ঘটিতে থাকে। বৌদ্ধ এবং হিন্দু উভয় ধর্মেরই অবনতির যুগে স্ব স্ব তন্ত্রশাস্ত্রের উদ্ভব হইয়াছিল। হিন্দু তন্ত্রসমূহের মূল লক্ষ্য দুর্গা অর্থাৎ শক্তিপূজার সাহায্যে ঐহিক সুখ, ধনার্জন, সৎকার্যের পুরস্কারপ্রাপ্তি, মুক্তিলাভ। শক্তিই মহাযানবাদে প্রজ্ঞা নামে অভিহিত হইয়াছে। শক্তিপূজার উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার মন্ত্রতন্ত্র, যাগযজ্ঞ, সমাধি-পূজা-হোমের সাহায্য লওয়া হইয়াছে। বৌদ্ধতন্ত্রসমূহও আপন অনুগামীদিগকে উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য অনুরূপ বিধি পালন করিতে নির্দেশ দিয়াছে। সে উদ্দেশ্য দীর্ঘজীবন লাভ করা, অপরাজেয় হওয়া অথবা আলকিমি বিদ্যার সাহায্যে ধনার্জন প্রভৃতি পার্থিব ইচ্ছা পূরণও হইতে পারে, আবার বুদ্ধত্ব অর্জন কিংবা সংশয় নিরাকরণে বোধিসত্ত্বের কৃপালাভ প্রভৃতি পারমার্থিক সম্পদলাভও হইতে পারে। তান্ত্রিক ও যৌগিক মতবাদের মধ্যে বহুল সাদৃশ্য বর্তমান। প্রকৃত প্রস্তাবে তন্ত্রকে যোগের সহজতর এবং ঈষৎ বিকৃত জনগণবোধ্য প্রক্রিয়া বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে।

"তারানাথ বলিয়াছেন যে পালবংশের রাজত্বকালে বহু ইন্দ্রজাল-বিশেষজ্ঞ ও মন্ত্রবজ্রাচার্য গৌড়ে দেখিতে পাওয়া যাইত। নানাপ্রকার সিদ্ধি তাঁহাদের করতলগত ছিল এবং তাঁহারা স্বভাবতই নানাপ্রকার অদ্ভুত ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকিতেন। পালরাজবংশ গৌড় এবং তন্নিকটবর্তী ভূভাগে ৮০০ হইতে ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এই সময়ে বিক্রমশিলার মঠ তন্ত্রচর্চার জন্য প্রভূত খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। পাল নরপতিবৃন্দ বৌদ্ধধর্মের উপাসক এবং বৌদ্ধ মতবাদের রক্ষক ছিলেন। অধুনাপ্রাপ্ত বহু শিলালেখ এবং কিংবদন্তি হইতে ইহা জানিতে পারা যায়।

"পূর্বভারতে পালবংশের পরই সেনবংশ আধিপত্য বিস্তার করেন। ইঁহারা বাহ্যত হিন্দুমতাবলম্বী হইলেও বৌদ্ধমতবাদের প্রতি কোনরূপ বৈরভাব পোষণ করিতেন না। কিন্তু তবুও স্বাভাবিক ভাবে বৌদ্ধধর্মের অনুরাগীর সংখ্যা ক্রমশ হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছিল। তুর্কী আক্রমণের পরই অর্থাৎ ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই এই সংখ্যাহ্রাস দ্রুততর হইতে থাকে। উদ্দণ্ডপুর ও বিক্রমশিলার প্রসিদ্ধ বিহার দুইটি ধ্বংস করিয়া ফেলা হইল। মঠবাসী সন্ন্যাসিগণের অনেকেই নিহত হইলেন, কেহ কেহ দেশ দেশান্তরে পলাইয়া গিয়া নিষ্ঠুর মৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিলেন। মহাপণ্ডিত শাক্যশ্রী প্রথমে উড়িষ্যা এবং তথা হইতে তিব্বতে পলাইয়া গেলেন, রত্নরক্ষিত গেলেন নেপালে, বুদ্ধমিত্র এবং আরও কয়েকজন দক্ষিণ ভারতে আশ্রয় লইলেন, সঙ্গম-শ্রীজ্ঞান সঙ্গীদিগকে লইয়া ব্রহ্মের পথে কম্বোজে চলিয়া গেলেন। শাক্যমুনির ধর্ম মগধে আপন সত্তা হারাইয়া ফেলিল। মগধ হইতে দক্ষিণ ভারতে আগত শ্রমণবৃন্দ পিতৃভূমির বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আদর্শে ক্ষুদ্রতর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন, কারণ দক্ষিণাপথে এই সময় বৌদ্ধধর্মের প্রচার শান্তিপূর্ণই ছিল।"

বৌদ্ধ শ্রমণগণ ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব গতিবেগের সঞ্চার করিয়াছিলেন বৌদ্ধধর্মের অবনতির যুগে ভারতবর্ষে তাহা একেবারে নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। ভারতীয় মনীষা যে প্রতিকূল আবহাওয়ায় একেবারে

শুদ্ধ হইয়া যায় নাই তাহার প্রমাণ অন্বেষণ করিতে আমাদিগকে অধিক দূর যাইতে হইবে না। ব্রাহ্মণ্যধর্মের উপাসক গুপ্ত অথবা তৎপরবর্তী শাসকগণের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে যে সমস্ত বিরাট প্রতিভার উদয় হইয়াছিল সমগ্র বিশ্ব চিরদিন তাহার সম্মান করিবে ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। কালিদাস ও ভবভূতি, ব্রহ্মগুপ্ত ও আর্যভট্ট, শংকর ও রামানুজের প্রতিভা হিন্দুগণ উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছেন। ইঁহারা শুধুমাত্র হিন্দুসমাজের গৌরবের সামগ্রী নহেন, সমগ্র সভ্যজগতের গৌরবের বস্তু।

ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সময় শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধগ্রন্থসমূহকে বর্জন করিবার স্পৃহা নব্যতন্ত্রবাদিগণের মধ্যে দেখা যায় নাই, বরঞ্চ ঐগুলিকে নিজস্ব করিয়া লইবারই একটা বিশেষ চেষ্টা সমস্ত দেশে দেখা গিয়াছিল। অমরসিংহ তাঁহার 'শব্দকোষে' এবং বাগ্‌ভট তাঁহার 'অষ্টাঙ্গহৃদয়ে'র প্রস্তাবনায়ই বুদ্ধের স্তুতিপাঠ করিয়াছেন। চরক এবং সুশ্রুতের বর্তমান প্রচলিতরূপ বৌদ্ধগণ কর্তৃক সংস্কারের সাক্ষ্য প্রদান করে। তারা, প্রজ্ঞাপারমিতা এবং বুদ্ধের নাম পরিবর্তন করিয়া হরপার্বতীর নাম সংযোগে বৌদ্ধতন্ত্রগুলি নবজাগ্রত হিন্দু সমাজে গৃহীত হইয়াছিল। এইভাবেই 'রসরত্নাকরে' উভয় সম্প্রদায়ের সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। নাগার্জুন, রত্নঘোষ এবং মাণ্ডব্য ও অপরাপর মনীষিগণের নিকট হিন্দুপ্রতিভার ঋণ অস্বীকার করিবার নহে।

গোবিন্দভাগবত প্রণীত 'রসহৃদয়' সম্ভবত একাদশ শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছিল। গ্রন্থে গোবিন্দভাগবত নিজেই বলিয়াছেন যে কিরাতভূমির[১৩] অধীশ্বরের অনুরোধক্রমে ভবিষ্যৎ বংশীয়দিগের উপকারার্থে তিনি 'রসহৃদয়' রচনা করিয়াছেন। গোবিন্দ নিজে বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থে সীসক এবং বঙ্গ বা রাং হইতে পারদের পৃথককরণ, ঊর্ধ্বপাতন ও তির্যকপাতনের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ, তুঁতে এবং ফটকিরির ব্যবহার ইত্যাদি বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

---

১৩ ভোটানের সংলগ্ন ভূখণ্ড

'রসার্ণব' দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, ইহা ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে।

সোমদেব বিরচিত 'রসেন্দ্রচূড়ামণি' এই যুগের অন্য একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। ইহাতে রৌপ্যশুদ্ধির যে প্রক্রিয়া প্রদত্ত হইয়াছে বর্তমান কালে অবলম্বিত প্রক্রিয়ার সহিত তাহার পার্থক্য কিছুই নাই বলা চলে।

বৈদ্যরাজ সিংহগুপ্তের পুত্র ভাগবত-রচিত 'রসরত্নসমুচ্চয়' হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। গ্রন্থকর্তা প্রথমেই বিশিষ্ট প্রাচীন রাসায়নিকগণের স্তুতিগান করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। 'রসরত্নসমুচ্চয়ে' বিবিধ ধাতু, বিশেষ করিয়া পারদ ও তাম্র এবং যশদ প্রভৃতির নিষ্কাশনবিধি প্রদত্ত হইয়াছে। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, বঙ্গ (রাং) সীসক, যশদ (দস্তা), পিত্তল, কাংস প্রভৃতির ব্যবহারবিধি প্রদত্ত হইয়াছে। 'রসরত্নসমুচ্চয়' অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে যে-কোন পাঠকই ইহার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করিবেন। রসায়নশাস্ত্রের যে-কোন আধুনিক গ্রন্থের সহিত 'রসরত্নসমুচ্চয়' তুলনীয়।

যশোধর-প্রণীত 'রসপ্রকাশসুধাকর'ও সম্ভবত ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত। যশোধর কুষ্ঠ ব্যাধির জন্য কর্পূররস (calomel) ব্যবহার করিতে বলিলেও উপদংশ ব্যাধিতে ইহার ব্যবহার সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করেন নাই। মাক্ষিক হইতে দস্তানিষ্কাশনপ্রক্রিয়া 'রসপ্রকাশসুধাকরে'র শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। তাঁহার গ্রন্থে যশোধর বারংবার এই কথাই বলিতে চাহিয়াছেন যে নিজে পরীক্ষা না করিয়া তিনি কোন পদ্ধতি গ্রন্থে সন্নিবেশ করেন নাই। যশোধর বলেন,—

স্বহস্তেন কৃতং সম্যক্ জারণং ন শ্রুতং ময়া।
স্বহস্তেন ভবযোগেন কৃতং সম্যক্ শ্রুতেন হি ॥
ধাতুবন্ধস্তৃতীয়োঽসৌ স্বহস্তেন কৃতো ময়া।
দৃষ্টপ্রত্যয়যোগোঽয়ং কথিতো নাত্র সংশয়ঃ ॥

তান্ত্রিক যুগের অসংখ্য গ্রন্থসমূহ একে অন্য গ্রন্থ হইতে তথ্যাবলী গ্রহণ করিয়াছে। অধিকাংশ গ্রন্থকর্তাই পূর্ববর্তীগণের নিকট স্ব স্ব ঋণ স্বীকার করিতে

কুণ্ঠিত হন নাই। দুঃখের বিষয় ভারতীয় রসায়নশাস্ত্রের আকর এই সমস্ত গ্রন্থের অনেকগুলিই আজ নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। যেগুলি বর্তমান আছে তাহাদের পাঠও সর্বত্র নির্ভরযোগ্য নহে। একই গ্রন্থের বহু পাণ্ডুলিপির পরস্পরের মধ্যে বহু পাঠবিভেদ বর্তমান। এইজন্যই তাহাদের সকলগুলি একত্র পাঠ করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আবশ্যক।

SENIOR BASIC ... COLLEGE * BANIPUR *

ঔষধ-বিজ্ঞানের যুগ

তান্ত্রিক যুগের সঞ্জীবনী সুধার কাল নিঃশেষ হইয়া আসিতে আসিতে অবশেষে হিন্দু রসায়ন ঔষধ-বিজ্ঞানে আসিয়া পৌছিল। চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে এই যুগ আরম্ভ হইয়াছিল বলা চলিতে পারে। পারদ, লৌহ, তাম্র প্রভৃতি ধাতুঘটিত অসংখ্য ঔষধের কোনটিই মানুষকে অমরতা অথবা মৃতের জীবনদান করিতে সক্ষম না হইলেও ইহা ইতিমধ্যেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়া উঠিয়াছিল যে রোগ দূরীকরণে ইহাদের অনেকগুলিই বিশেষ কার্যকর। প্রথমে চরক ও সুশ্রুত-বর্ণিত বহুবিধ বনজ ঔষধের সহিত ধাতুঘটিত দুই চারিটি ঔষধ বিশেষ সাবধানতা সহকারেই ব্যবহার করা হইত, কিন্তু কালক্রমে এই ধাতুঘটিত ঔষধাবলীই হিন্দু চিকিৎসাবিজ্ঞানে একটা মুখ্য স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। ইহার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ার ফলে বনজ ঔষধের ব্যবহার ক্রমশই কমিয়া আসিল। 'রসরত্নসমুচ্চয়ে'র সমকালবর্তী 'রসেন্দ্র-চিন্তামণি' নামক গ্রন্থের একটি শ্লোকে পরিষ্কার এই কথাই বলা হইয়াছে যে, "হে গুরো, দুর্বল এবং ভীরুগণের উপকারার্থে আমাকে এমন একটি চিকিৎসাবিজ্ঞানে উপদেশ প্রদান কর যাহাতে শল্যশাস্ত্রের ব্যবহার একেবারেই অপ্রয়োজনীয় হইয়া যাইবে।" বলা বাহুল্য পারদঘটিত ঔষধসমূহের বহুল ব্যবহারের ইহা একটি বিশেষ হেতুবাদ ছিল মাত্র।

ঔষধ-বিজ্ঞানের যুগে যে সমস্ত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল তাহাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নাগার্জুনের প্রভাব সুপরিস্ফুট। বস্তুত নাগার্জুনই তির্যক্‌পাতন ও দহন (calcination) প্রক্রিয়াদ্বয়ের উদ্ভাবক। আলকিমি-বিদ্যাবিশারদ সপ্তবিংশতি বুধমণ্ডলীর অন্যতম বলিয়া 'রসরত্নসমুচ্চয়ে'র গ্রন্থকর্তা তাঁহাকে তদীয় গ্রন্থে প্রথমেই বন্দনা করিয়াছেন এবং 'ধাতুবাদ' সম্পর্কে তাঁহার মতামত প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। 'রসেন্দ্রচিন্তামণি'-গ্রন্থকার এবং চক্রপাণিও

তাঁহার অনুরূপ স্তুতি করিয়াছেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে বৃন্দ এবং চক্রপাণির মতে নাগার্জুনই কজ্জলীর আবিষ্কর্তা এবং কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থকর্তার মতে নাগার্জুনই সুশ্রুতেরও সংকলয়িতা।

চক্রপাণির টীকাকার পাণিনির টীকাকার পতঞ্জলিকে লৌহশাস্ত্র-বিশারদ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পতঞ্জলি খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া অনুমান করিতে পারা যায়। চক্রপাণি পতঞ্জলিকে চরকের সংকলয়িতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত 'ন্যায়বর্তিকা' গ্রন্থে ভোজ বলিয়াছেন, 'পতঞ্জলি দেহ এবং মন উভয়েরই চিকিৎসক।'

যোগেন চিত্তস্য পদেন বাচাং মলং শরীরস্য তু বৈদ্যকেন।
যোঽপাকরোৎ তং প্রবরং মুনীনাং পতঞ্জলিং প্রাঞ্জলিরানতোঽস্মি ॥

পতঞ্জলির যোগদর্শনে যে মোক্ষের কথা বলা হইয়াছে তাহার সহিত আলকিমি-বিদ্যার বহুল সংযোগ বিদ্যমান।

তান্ত্রিক-মতাবলম্বী এবং আলকিমি-বিদ্যার অনুসরকগণের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া রসায়নশাস্ত্রের ভারতীয় ছাত্রগণ অনন্তকাল অযথা সময় নষ্ট করেন নাই। জীবকে অমরত্ব প্রদানে প্রয়াসী হইয়া অন্ততপক্ষে তাঁহারা আধিব্যাধিকে দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ঔষধ-বিজ্ঞানের যুগে যে সমস্ত মূল্যবান গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে তাহার মধ্যে মালবের রাজবৈদ্য মথনসিংহ প্রণীত 'রসনক্ষত্রমালিকা' অন্যতম। এই গ্রন্থের ১৫৫৭ সংবৎ অর্থাৎ ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে অনুলিখিত পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে মনে হয়, গ্রন্থের প্রণয়নকাল তাহারও অনেক পূর্বে। ধাতুঘটিত ঔষধের প্রস্তুতবিধির উল্লেখ এই গ্রন্থের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য পদার্থের সহিত অহিফেনের ব্যবহার এবং রাং, লৌহ ও পারদভস্মের সহিত অন্যান্য ঔষধের মিশ্রণ প্রস্তুত 'স্বচ্ছন্দ-ভৈরব-রসে'র উল্লেখ 'রসনক্ষত্রমালিকা'য় দেখিতে পাওয়া যায়।

পার্বতী-সুত সিদ্ধ নিত্যনাথ প্রণীত 'রসরত্নাকর' গ্রন্থের প্রস্তাবনায় বলা হইয়াছে, "রসার্ণবে উক্ত পারদঘটিত ঔষধের ব্যবহার সম্বন্ধে ভগবান শিব-

বর্ণিত তথ্যসমূহ, 'রসমঙ্গলদীপিকা'য় পারদ সম্বন্ধে এবং রোগাক্রান্ত জনগণের মঙ্গলার্থে নাগার্জুন প্রস্তাবিত সিদ্ধ চর্পটি, বাগ্‌ভট ও সুশ্রুত-উক্ত মতবাদ এবং ধাতু ও পারদ ঘটিত ঔষধ সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি। যে সমস্ত ঔষধ দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্লভ হইয়াছে সেগুলিকে বাদ দিয়া অন্যগুলির মূলতত্ত্বসমূহ আমি একত্র সংকলিত করিলাম। * * * * আমি আমার শিক্ষকবৃন্দের নিকট যাহা শিক্ষা করিয়াছি এবং যে সমস্ত বিষয় স্বয়ং পরীক্ষা করিতে পারিয়াছি মানবের হিতার্থে কেবল তাহাই এই গ্রন্থে স্থানলাভ করিয়াছে।" 'রসেন্দ্র-চিন্তামণি' গ্রন্থের রচয়িতা ঢুণ্ঢুকনাথ তদীয় গ্রন্থের ভূমিকায় বলিয়াছেন,—"আমি মাত্র সেই সমস্ত প্রক্রিয়ার প্রচার করিব যাহা আমি স্বহস্তে পরীক্ষা করিতে পারিয়াছি।" অন্যত্র—"পারদঘটিত সেই সমস্ত ঔষধ আমার গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে যাহা আমি নিজে পরীক্ষা করিতে পারিয়াছি। যাঁহারা নিজেরা পরীক্ষা করিতে না পারিলেও শিক্ষাদান করিতে চান তাঁহারা বৃথাই পরিশ্রম করেন।"

এই যুগের 'রসসার' নামক অন্য একখানি গ্রন্থে হিন্দু রাসায়নিকমণ্ডলীর পারদ সম্পর্কিত জ্ঞানের পরিচয় বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থকর্তা গোবিন্দাচার্য ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাবলম্বী বলিয়া প্রথমেই শিব এবং বিষ্ণুর বন্দনা করিয়াছেন এবং এই উপলক্ষ্যে স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি অন্যান্য প্রচলিত প্রামাণিক গ্রন্থরাজি হইতে আবশ্যক তথ্যসমূহ সংগ্রহ করিয়াছেন। কতকগুলি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বিবরণ সম্বন্ধে "এবং বৌদ্ধা বিজানন্তি ভোটদেশনিবাসিনঃ" বলিয়া তিনি তিব্বতস্থ বৌদ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট তাঁহার ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। গ্রন্থশেষে একস্থলে গোবিন্দাচার্য বলিয়াছেন, "বৌদ্ধমতং তথা জ্ঞাত্বা রসসারঃ কৃতো ময়া।" গোবিন্দাচার্যের এই সকল স্বীকৃতি এবং উক্তি হইতে ইহা স্পষ্ট বোঝা যায় যে এই সময় ভারতভূমিতে আলকিমির চর্চা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল এবং সুদূর তিব্বতে তখনও ইহা চলিতেছিল। এইজন্যই গোবিন্দাচার্যকে তথ্যসমূহের জন্য ভোটদেশবাসী বৌদ্ধ বুধমণ্ডলীর দ্বারস্থ হইতে হইয়াছিল।

'রসসারে'র রচনাকাল নির্ণয় করার একটা সুবিধা এই আছে যে, ইহাতে ঔষধ হিসাবে অহিফেনের ব্যবহারের নির্দেশ পাওয়া যায়। এইখানে একটা কথা উল্লেখযোগ্য যে অহিফেন ব্যবহারের নির্দেশ দিলেও গোবিন্দাচার্য ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। অহিফেনকে তিনি বিষধর সামুদ্রিক মৎস্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন,—

সমুদ্রে চৈব জায়ন্তে বিষমৎস্যাশ্চতুর্বিধাঃ
তেভ্যঃ ফেনং সমুৎপন্নম্ অহিফেনো বিষং স চতুর্বিধম্
কেচিদ্বদন্তি সর্পাণাং ফেনং স্যাদহিফেনকম্।

অন্যান্য প্রমাণ প্রয়োগ আলোচনা করিয়া 'রসসার'কে অনায়াসে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।

এযুগের অন্য একখানি গ্রন্থ 'শার্ঙ্গধরসংগ্রহে' ঔষধার্থে সাতটি মৌলিক ধাতু এবং পিত্তল ও কাংসের ব্যবহার-নির্দেশ রহিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় শার্ঙ্গধর দস্তার ব্যবহার সম্বন্ধে কোন উল্লেখমাত্র করেন নাই। এই গ্রন্থ প্রধানত আয়ুর্বেদ গ্রন্থসমূহকে (চরক-সংহিতা) ভিত্তি করিয়া লিখিত। গ্রন্থকারের পিতার নাম দামোদর এবং পিতামহ চৌহান ভূপতি হম্মীর বা হামীরের সভাসদ রাঘবদেব।

গোপালকৃষ্ণ বিরচিত 'রসেন্দ্রসারসংগ্রহে' প্রথমেই বলা হইয়াছে যে বিভিন্ন তন্ত্রশাস্ত্র বিশেষ করিয়া 'রসমঞ্জরী' এবং 'চন্দ্রিকা' তন্ত্রদ্বয় আলোচনা করিয়া এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। ইহাতেও ধাতুঘটিত ঔষধসমূহের উপর অতিরিক্ত দৃষ্টি প্রদত্ত হইয়াছে এবং আয়ুর্বেদোক্ত বনজ ঔষধসমূহকে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্থান দেওয়া হইয়াছে। রাসায়নিক জ্ঞানের দিক হইতে বিচার করিলে মনে হয় ইহা 'শার্ঙ্গধরসংগ্রহ' অপেক্ষা নিকৃষ্টতর।

'রসেন্দ্রকল্পদ্রুম' নামক এই যুগের অপর একখানি গ্রন্থও প্রধানত ধাতব পদার্থসমূহের আলোচনায়ই মুখর। 'রসার্ণব', 'রসমঙ্গল', 'রত্নাকর', 'রসামৃত' এবং 'রসরত্নসমুচ্চয়' হইতে বহু শ্লোক ইহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

'ধাতুরত্নমালা' নামক এই যুগের আর একখানি গ্রন্থেরও উল্লেখ এইস্থলে করা যাইতে পারে। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সীসক, রাঙ এবং লৌহ, মাত্র এই ছয়টি ধাতুর ব্যবহারের বিধি 'ধাতুরত্নমালা'র প্রথম দিকে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু যশদ অর্থাৎ দস্তাকে খর্পর বলিয়া উল্লেখ করিয়া তাহার ব্যবহারবিধিও এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে।

আধুনিক যুগ

১৫০০-১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ

হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের আধুনিক যুগ ১৫০০ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। এই যুগে অহিফেন ব্যতীত আরও কয়েকটি নূতন বৈদেশিক ঔষধের ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ভারতের বেলাভূমিতে পোর্তুগীজদের আগমনের এবং উপনিবেশ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে কতকগুলি নূতন ব্যাধির প্রসার হইয়াছিল। হিন্দু চিকিৎসকমণ্ডলী এই সকল নূতন রোগের ঔষধ নির্ণয়ের চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। চরক সুশ্রুত হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তীকালের বিশিষ্ট হিন্দু চিকিৎসকগণ উপদংশ রোগের বর্ণনা এবং তাহার চিকিৎসাতত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সিফিলিস বলিলে যাহা বুঝায় সেই ব্যাধির বিষয়ে তাঁহাদের কেহই কোন কথা বলেন নাই। এই আধুনিক যুগে 'রসপ্রদীপ' নামক চিকিৎসাগ্রন্থে 'ফেরঙ্গ' রোগ নামক যে রোগের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা যে সিফিলিস এ সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। বস্তুত-পক্ষে হিন্দু চিকিৎসাপদ্ধতিতে ফেরঙ্গ রোগের ইহাই প্রথম উল্লেখ।

ফ্ল্যাকিগার (Flückiger) ও হ্যানবেরীর (Hanbury) মতে ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময় চৈনিক ব্যবসায়িগণ গোয়াবাসী পোর্তুগীজদের নিকট ফেরঙ্গ রোগের ঔষধ হিসাবে পারদঘটিত ক্যালোমেল ও যবচিনির ব্যবহারবিধি প্রচার করেন। ইহা হইতে 'রসপ্রদীপে'র রচনাকাল সম্বন্ধে একটা মোটামুটি আভাস পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে অজৈব অম্ল সম্বন্ধেও উল্লেখ করা হইয়াছে। এই অম্লকে শঙ্খদ্রাবক বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। পরবর্তীকালে রচিত 'ভাব-প্রকাশ' গ্রন্থে কিন্তু শঙ্খদ্রাবকের কোনই উল্লেখ দেখা যায় না।

'রসকৌমুদী' নামক গ্রন্থ আরও পরবর্তীকালের রচনা। ইহার রচয়িতা মাধবকে অনেকেই 'নিদানসংগ্রহে'র রচয়িতা মাধবকর বলিয়া ভুল করিয়াছেন। কিন্তু উভয়ে এক লোক নহেন। তাঁহাদের মধ্যে কালের ব্যবধান অন্যূন আট-নয় শত বৎসর হইবে। এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ রাসায়নিক গ্রন্থ বোধ হয় 'রুদ্রযামল' তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত 'ধাতুক্রিয়া'। হরপার্বতীর কথোপকথন ছলে এই গ্রন্থ লিখিত। ইহাতে ফেরঙ্গ জাতির বাসস্থান এবং বর্ত্তমান কনস্টান্টিনোপলের তৎকালপ্রচলিত আরবীয় নাম রুমের উল্লেখ থাকায় মনে হয় ইহা ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে রচিত হয় নাই। ইহাতে দাহজল অথবা গন্ধকাম্লের (Sulphuric Acid) উল্লেখ আছে।

ইহার পূর্বে ভারতবর্ষে অজৈব অম্লের সাহায্যে ধাতু দ্রবণ করার ব্যবস্থা জানা ছিল বলিয়া মনে হয় না। এইখানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য এই যে 'রসপ্রদীপে'র পরবর্তী গ্রন্থ 'ভাবপ্রকাশে' শঙ্খদ্রাবক সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই, বলা বাহুল্য ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষে অজীর্ণ, প্লীহা এবং যকৃতের ব্যাধির জন্য এই শঙ্খদ্রাবকের ব্যবহার প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল। 'ভাবপ্রকাশ' কিন্তু অম্লস্বাদের ফলের রস ব্যতীত অন্য অম্ল ব্যবহারের নির্দেশ দেন নাই।

'ভাবপ্রকাশে'র রচয়িতা ভাবমিশ্র। চরক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট, হারীত, বৃন্দ এবং চক্রপাণির গ্রন্থ হইতে 'ভাবপ্রকাশ' সংকলিত হইয়াছিল বলিয়া ইহাতে বনৌষধিরই অধিকতর আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। রসপ্রদীপ রসেন্দ্রচিন্তামণি, শার্ঙ্গধর প্রমুখ প্রামাণিক গ্রন্থসমূহ হইতে ধাতুঘটিত ঔষধাদি সম্বন্ধে দুই-একটি অধ্যায়ও ইহাতে দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থকার ভাবমিশ্র মধ্যপ্রদেশের কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি আকবর বাদশাহের সমসাময়িক ছিলেন। 'ভাবপ্রকাশে' মুসলমানপ্রভাব সুস্পষ্ট।

এই যুগের অন্যতম গ্রন্থ 'অর্কপ্রকাশ' লঙ্কেশ্বর রাবণ কর্তৃক বিরচিত বলিয়া গ্রন্থে কথিত হইয়াছে। গ্রন্থখানিতে মুখ্যত অরিষ্ট ও ক্বাথ প্রস্তুতপ্রণালী সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। প্রণেতার নাম জানিবার কোন উপায় না থাকিলেও

ইহার আনুমানিক রচনাকাল নির্ণয় করা অসম্ভব নহে। শঙ্খদ্রাবক ও পারদের সংমিশ্রণে ফেরঙ্গ রোগের ঔষধ প্রস্তুতবিধি 'অর্কপ্রকাশে' প্রদত্ত হইয়াছে। অহিফেনের ব্যবহারও এই গ্রন্থে বলা হইয়াছে, এবং দস্তাকেও ইহাতে যশদ আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে। রাঙ্ঃসংযুক্ত তাম্রপাত্র ব্যবহার পাতন-প্রক্রিয়ায় প্রশস্ত বলিয়া বলা হইয়াছে। অর্কপ্রকাশেও মুসলমানপ্রভাব বিশেষ রূপে প্রকট। একথা মনে করা অসঙ্গত হইবে না যে অর্ক শব্দটি আরবী শব্দ 'অরক্'-শব্দের সংস্কৃত অপভ্রংশ মাত্র।

ভারতের নিকট আরবের ঋণ

পাশ্চাত্যদেশে বিজ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্রের প্রচারে আরবীয়গণের অবদান সর্বজন-স্বীকৃত। অতিদূর অতীতে সমগ্র ইউরোপখণ্ডে যখন জ্ঞানের আলোক ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল, গ্রীক সভ্যতার শেষ রশ্মিটুকু যখন মুষ্টিমেয় সাধুসন্ন্যাসীর অপরিসর প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, প্রাচ্যের বহুবিস্তীর্ণ জ্ঞানভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠ রত্নসমূহ লইয়া আরবীয়গণ তখন ইউরোপের গৃহদ্বারে সমুপস্থিত হইলেন। অর্থাৎ জ্ঞানবিজ্ঞানে ইউরোপের বর্তমান অগ্রগতির বীজ আরবীয়গণের সাহায্যে উপ্ত হইল মাত্র।

অল্-নদীম্ নামে পরিচিত আবুল ফরজ মহম্মদ বিন ইশাক্ দশম শতাব্দীতে রচিত তদীয় কিতাব-অল-ফিরিস্ত্ গ্রন্থে এবং হাজী খলিফা ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ইবন-আবু-উসাইবিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে খলিফা হারুন ও মনসুরের আদেশে হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্র, ভৈষজ্যবিজ্ঞান ও ঔষধিতত্ত্ব সম্পর্কিত বহু প্রামাণিক গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। ভুস্টেনফেল্ট্ (Wustenfeld), ডীট্‌স্ (Dietz), কিউয়র্টন (Cureton), ফ্ল্যুগেল (Flügel), ম্যুলর (Müller) এবং অন্যান্য প্রাচীন আরবীয় সাহিত্যের গবেষকগণ এসম্বন্ধে বহু প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন।

মঙ্খ নামক জনৈক ভারতীয় চিকিৎসক খলিফা হারুন-অল-রশিদের দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় করিয়া রাজকীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ের চিকিৎসক নিযুক্ত হন। খলিফার প্রেরণা এবং উৎসাহে তিনি আরবী ভাষায় সুশ্রুতের অনুবাদ এবং ভারতে ব্যবহৃত বনৌষধিসমূহের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করেন। আরবী ভাষায় চরকের অনুবাদও প্রকাশিত হইয়াছিল।

হাজী খলিফা অনেকস্থলে প্রশংসামুখর হইয়া বলিয়াছেন যে হিন্দু জ্যোতি-

বিজ্ঞান, বীজগণিত এবং চিকিৎসাবিজ্ঞান আরবীয় ছাত্রসমাজ গভীর আগ্রহের সহিত পাঠ করিত। বহু হিন্দু পণ্ডিত খলিফাগণের আমন্ত্রণে বগদাদে আসিয়া বসবাস করিতেছিলেন। জ্ঞানলাভের অদম্য স্পৃহায় উদ্বুদ্ধ হইয়া আরবীয় বৈজ্ঞানিকবৃন্দ হিন্দু পণ্ডিতগণ পরিচালিত ভারতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহে দলে দলে সমবেত হইতেন। বস্তুতপক্ষে ভারতবর্ষে গিয়া বিজ্ঞানচর্চা না করিলে মুসলমান বৈজ্ঞানিকগণের বিজ্ঞানশিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইত না।

খলিফাগণের উৎসাহ এবং পৃষ্ঠপোষকতায়ই যে মুসলমান ছাত্রগণ শিক্ষার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে আসিতেন তাহা নহে, তাহারও বহু বৎসর পূর্বে (৫৩১ হইতে ৫৭২ খৃষ্টাব্দের মধ্যেও) বগদাদ হইতে বিজ্ঞানশিক্ষার উদ্দেশ্যে বহু মুসলমান ছাত্র ভারতে আসিয়াছিলেন তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।[১৪]

ম্যুলর প্রাচীন আরবীয় সাহিত্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে কেবলমাত্র চরক এবং সুশ্রুত নহে, পরন্তু আরও অনেক গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। নিদান, অষ্টাঙ্গ, শণক রচিত বিষ সম্পর্কিত একখানি গ্রন্থ, শৈত্য এবং উষ্ণতা সম্বন্ধীয় একখানি এবং আরও অনেক ভারতীয় গ্রন্থ ম্যুলরপ্রদত্ত তালিকায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই জার্মান পণ্ডিত আরও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে বহু ভারতীয় চিকিৎসক বগদাদে নিয়মিত ভাবে চিকিৎসা-ব্যবসায় করিতেন।

রসায়ন সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ভারতপর্যটক আলবেরুনির অভিমত ইতিপূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে। আলবেরুনি ১০১৭ হইতে ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে অবস্থিতি করেন। আলবেরুনির প্রভু গজনীপতি সুলতান মামুদ যখন থানেশ্বর, মথুরা, কনৌজ ও সোমনাথের মন্দির নির্বিচারে লুণ্ঠন করিয়া ভারতময় বিভীষিকার সঞ্চার করিয়া ফিরিতেছিলেন তখন এই জ্ঞানলিপ্সু মুসলমান ছাত্রটি তাঁহার হিন্দু অধ্যাপকবৃন্দের পদতলে বসিয়া সাংখ্য ও পাতঞ্জলের প্রখ্যাত গ্রন্থপাঠে

১৪—de Sacy : Calila et Dimna on Fables de Bidpai, (1816), p. 28.

আত্মহারা হইতেছিলেন। আলবেরুনির মৃত্যুর পর তাঁহার প্রসিদ্ধ পারিবারিক গ্রন্থাগার হইতে আলি-বিন-জৈন (Ali-Ibn-Zain) অনূদিত একখণ্ড 'চরক-সংহিতা' পাওয়া যায়। শিক্ষিত আরব অভিজাতের গৃহে চরকসংহিতার এই সমাদর দেখিয়া বোঝা যায় মুসলমানগণ হিন্দু চিকিৎসাপদ্ধতিকে কিরূপ সম্মানের দৃষ্টিতে দেখিতেন। এই সময় গজনীতে গ্রীক চিকিৎসাপদ্ধতিও প্রসার লাভ করিয়াছিল এবং গ্রীক ও ভারতীয় উভয় পদ্ধতিই পাশাপাশি সমান আদরের সহিত অনুসৃত হইত।

আরবী ভাষায় চরক, সুশ্রুত, নিদান ও অষ্টাঙ্গের অনুবাদসমূহের নাম যথাক্রমে সরক, সুশ্রুদ, বদান এবং অশাঙ্কর দেওয়া হইয়াছে। ভাষান্তরের সময় নামের বিকৃতি ঘটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক একথা ভুলিয়া গেলে চলবে না। লা-ফঁতেন (La Fontaine) পিল্‌পে (Pilpay) অথবা বিদ্‌পাই (Bidpai) নামক হিন্দু গ্রন্থকর্তার কতকগুলি রচনা আপন গ্রন্থে সন্নিবেশ করিয়াছেন এবং পিল্‌পের নিকট তাঁহার ঋণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এখন দেখা যাইতেছে পিল্‌পে অথবা বিদ্‌পাই ও বিদ্যাপতি এক।

পৃথিবীর রাসায়নিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রাচীন হিন্দুগণের অবদান যথাযথভাবে স্বীকৃত হয় নাই। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকবর্গের অনেকেই আরবীয়গণকে রসায়ন-বিজ্ঞানে মূল ব্রতী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু ভারতীয়গণের নিকট আরবীয়গণের ঋণ তাঁহারা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। অধ্যাপক জা়খাউ (Sachau) এবং অধ্যাপক ম্যাকডোনেল (Macdonell) অবশ্য ইহার ব্যতিক্রম। অধ্যাপক জা়খাউ বলেন, "আরবীয় সাহিত্যের জন্মভূমি দামাস্কস নহে—বগদাদ। আব্বাস-বংশীয় খলিফাগণের পৃষ্ঠপোষকতায় আরবীয় সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছিল।

"৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আরবীয় সাহিত্যের মূল ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদেশী সাহিত্যের সাহায্য লইয়া নানাদিকে বিরাট সাহিত্য

গড়িয়া উঠিয়াছিল। গ্রীস, পারস্য এবং ভারতবর্ষ আরবীয় মনের উর্বরতা রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল।

"ভারতবর্ষের দান দুইটি বিভিন্ন পথে বগদাদে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই পথ দুইটির একটি হইতেছে সোজা সংস্কৃত হইতে আরবী ভাষায় অনুবাদের পথ, অন্যটি ভারত হইতে ইরানের মধ্য দিয়া আরবে যাইবার পথ। অর্থাৎ সংস্কৃত (পালি এবং প্রাকৃত?) হইতে গ্রন্থনিচয় প্রথমে পারসী ভাষায় এবং পরে পারসী হইতে আরবী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। এই ভাবে কলিল-ও-দিম্না (করটকদমনক)-এর গল্পসমূহ এবং একখানি বিখ্যাত হিন্দু চিকিৎসা-গ্রন্থ, সম্ভবত চরক, আরবীয় সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল।

"ভারত ও বগদাদের পরস্পর সংযোগ কেবলমাত্র দুইটি বিভিন্ন পথে নহে, দুইটি বিভিন্ন সময়ে সংসাধিত হইয়াছিল।

"সিন্ধু-প্রদেশ খলিফা মনসুরের (৭৫৩-৭৭৪ খ্রী.) শাসনাধীনে আসিয়াছিল। ভারতের এই অংশ হইতে বগদাদে যে সমস্ত প্রতিনিধি আসিতেন তাঁহাদের সহিত পণ্ডিত ব্যক্তিও অনেক থাকিতেন। এই সমস্ত পণ্ডিতবর্গ বিশেষ করিয়া দুইখানি গ্রন্থ লইয়া আসেন। একখানি ব্রহ্মগুপ্ত প্রণীত ব্রহ্মসিদ্ধান্ত (সিন্দ্ হিন্দ্), অপর খানি তাঁহার খণ্ডখাদ্যক (আরকান্দ্)। এই সকল পণ্ডিতের সাহায্যে অল্-ফজরী (Alfazari) এবং সম্ভবত ইয়াকুব-বিন-তারিকও গ্রন্থ দুইখানির অনুবাদ করেন। গ্রন্থ দুইখানির বহুল ব্যবহার করা হইত, এবং উহারা প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই ভাবেই আরববাসিগণ জ্যোতির্বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক পাঠ প্রথম গ্রহণ করিতে সক্ষম হইলেন। টলেমির (Ptolemy) নিকট হইতে পাঠ লইবার অনেক পূর্বেই আরবীয়গণ ব্রহ্মগুপ্তের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন।

"হারুনের রাজত্বকালে (৭৮৬-৮০৮ খ্রী.) পুনরায় বহু হিন্দু শিক্ষক বগদাদে আসিয়াছিলেন। গদীতে সমাসীন বর্মক (Barmak) পরিবার বল্খ্ প্রদেশ হইতে রাজপরিবারের সহিত আসিয়াছিলেন। এই সময় তাঁহারা

ক্ষমতার উচ্চতম শিখরে অধিষ্ঠিত। তাঁহাদের জনৈক পূর্বপুরুষ বৌদ্ধ মঠ 'নববিহারে'র কর্মকর্তা ছিলেন। বর্‌মক শব্দটি মঠাধ্যক্ষ-পরিচায়ক 'পরমক' শব্দটিরই অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়। বর্‌মক পরিবার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেও তাঁহাদের সমসাময়িকেরা ইসলামের প্রতি তাঁহাদের আনুগত্য সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহের ভাবই পোষণ করিতেন। সম্ভবত পারিবারিক প্রথা পালনের প্রেরণায় তাঁহারা ছাত্রগণকে চিকিৎসাশাস্ত্র ও ভেষজবিজ্ঞান পাঠ করিবার জন্য ভারতবর্ষে প্রেরণ করিতেন; ভারতীয়গণকে কর্মে নিয়োগ করিয়া বগদাদে লইয়া আসিতেন এবং আরবীয় দাতব্য চিকিৎসালয়সমূহের প্রধান চিকিৎসকের কর্তব্যভার তাঁহাদের উপর অর্পণ করিতেন। বর্‌মক-মন্ত্রিগণের নির্দেশে ঔষধিতত্ত্ব, চিকিৎসাশাস্ত্র, দর্শন, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিদ্যার প্রামাণিক গ্রন্থসমূহ মূল সংস্কৃত হইতে এই সকল পণ্ডিতের সাহায্যেই আরবীতে অনূদিত হইয়াছিল।"

আরব হইতে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা ইউরোপে ছড়াইয়া পড়ে। সুতরাং ভারতের নিকট আরবের ঋণ সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিলেই বোঝা যাইবে সভ্য জগতে প্রাচীন ভারতের স্থান কোথায় ছিল। ভারতীয় রসায়ন-শাস্ত্র চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পরিপূরক হিসাবেই গড়িয়া উঠে, সুতরাং যাঁহারা চিকিৎসাবিজ্ঞানের জন্য ভারতীয় গ্রন্থসমূহকে এত সম্মান করিয়াছেন তাঁহারা যে রসায়নবিজ্ঞানের প্রথম পাঠও হিন্দু রাসায়নিকগণের নিকটই লাভ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ করিবার কি কারণ থাকিতে পারে?

প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানের অবনতি

প্রাচীন ভারতে উচ্চবর্ণের লোকেরাই শিল্পবিজ্ঞানের চর্চা করিতেন। শুক্ল যজুর্বেদ অথবা তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আমরা যে সকল বৃত্তির উল্লেখ দেখি তাহা হইতে তৎকালীন সমাজব্যবস্থার কিছুটা অনুমান করা যায়। দুঃখের বিষয় জন্মগত জাতিভেদ প্রথা প্রবর্তিত হইবার ফলে শিল্পবিজ্ঞানের চর্চায় বিশেষ ব্যাঘাত জন্মিয়া ছিল। বাৎস্যায়নের 'কামসূত্রে' উল্লিখিত চৌষট্টি কলার মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

রূপ্যরত্নপরীক্ষা—রূপা এবং রত্নাদির পরীক্ষা ও মূল্য নিরূপণ।

ধাতুবাদ—ধাতুনিষ্কাশন এবং রসায়নের চর্চা।

মণিরাগাকরজ্ঞান—মণিরত্নাদির বর্ণ ও খনি প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান।

শুক্রাচার্য কথিত 'শুক্রনীতিসার' গ্রন্থেও বিভিন্ন কলার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। যথা—'পাষাণধাত্বাদিদৃতিস্তদ্‌ভস্মীকরণং কলা' অর্থাৎ ধাতু ও প্রস্তরসমূহ বিদ্ধকরণ ও তাহাদের ভস্মীকরণ সম্পর্কিত কলা। 'ধাত্বৌষধীনাং সংযোগক্রিয়াজ্ঞানং কলা স্মৃতা'—ধাতু এবং লতাপাতার সংযোগ কলা হিসাবে গণ্য হইত।

ধাতুসাঙ্কর্যপার্থক্যকরণন্ত কলা স্মৃতা।
সংযোগাপূর্ববিজ্ঞানং ধাত্বাদীনাং কলা স্মৃতা॥

ধাতুমিশ্রণ (alloying) প্রস্তুতি ও তাহাদের বিশ্লেষণ বিভিন্ন কলার অন্যতম।

কবি বাণের জনৈক বন্ধু ধাতুনিষ্কাশন ব্যবসায় করিতেন। সংস্কৃত সাহিত্যে 'লোহবিদ্' ও 'ধাতুবিদ্' প্রভৃতি শব্দের বহুল ব্যবহার দেখিয়া অনুমান করা যায় তখনকার দিনে ধাতুনিষ্কাশকসম্প্রদায় সমাজে অপেক্ষাকৃত সম্মানের আসনই অধিকার করিয়াছিলেন। রঞ্জনশিল্পও ভারতবর্ষে সাফল্য ও সমৃদ্ধি অর্জন করিয়াছিল।

বৈদিক যুগে ঋষিরা কেহই জাতিগত বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য ছিলেন না, আপন আপন রুচিপ্রবৃত্তি এবং সুযোগসুবিধা অনুযায়ী বৃত্তি অবলম্বনের স্বাধীনতা সকলেরই ছিল। বৌদ্ধপরবর্তী যুগে যখন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করিল তখন কিন্তু অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। যাজক সম্প্রদায়ের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া মনু প্রভৃতি পরবর্তী স্মৃতিশাস্ত্র-রচয়িতারা নূতন নূতন নিয়মের নাগপাশে সমগ্র সমাজকে বাঁধিয়া ফেলিলেন। সুশ্রুতের মতে শল্যশাস্ত্রের শিক্ষার্থীর পক্ষে শবব্যবচ্ছেদ অবশ্য-কর্তব্য বলিয়া নির্ধারিত হইলেও মনু ব্যবস্থা দিলেন শব স্পর্শ করিলেই ব্রাহ্মণ অশুচি হইবেন। বাগ্‌ভটের অল্পকাল পরেই শল্যশাস্ত্র এবং শারীরস্থান (anatomy) ক্রমশঃ নিন্দনীয় বলিয়া গণ্য হইতে আরম্ভ করে এবং শেষ পর্যন্ত এই দুইটি বিজ্ঞান হিন্দুদিগের পক্ষে লুপ্ত-বিজ্ঞান হইয়া দাঁড়ায়। তথাকথিত উচ্চবর্ণের ভদ্রলোকেরা সমাজের অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের ব্যক্তিগণের হস্তে কলাচর্চার ভার অর্পণ করিয়া নিজেরা অন্য ক্ষেত্রে মনোনিবেশ করিলেন।

অনভিজাত শ্রেণীর হস্তে শিল্পকলার ভার অর্পিত হওয়ায় এবং জন্মগত জাতিভেদ প্রথা প্রবর্তিত হওয়ায় অবশ্য কিছুটা সূক্ষ্মতা এবং শ্রেষ্ঠত্ব শিল্পসমূহে আমদানি হইয়াছিল, কিন্তু যে মূল্যে ইহা পাওয়া গিয়াছিল তাহা ভারতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমাধি রচনার পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল। বুদ্ধিমান ও শিক্ষিতসমাজ শিল্প-সমূহের দিক হইতে দৃষ্টি সরাইয়া লওয়ায় শিল্পগুলির পক্ষে গতানুগতিকতার হাত হইতে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল, 'কি এবং কেন' যাহারা বুঝিতে পারিত তাহারা নিরাসক্ত হওয়ায় শিল্পগুলির ক্রমোন্নতি বা অগ্রগতিতে পূর্ণচ্ছেদ পড়িয়া গেল। পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের সহিত হিন্দুমনীষার সংস্রব ছিন্ন হওয়ায় ভারতভূমিতে বয়েল বা নিউটনের আবির্ভাব অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল।

হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুদয়ের যুগে ভারতীয় সমাজে যে বিরাট পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিল ভারতে বিজ্ঞানের অবনতির কারণ নির্দেশ করিতে বসিয়া তাহাকেও

একেবারে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। শংকরাচার্য কর্তৃক পরিমার্জিত এবং পরিবর্তিত বেদান্তদর্শনের ভাষ্যে পার্থিব সুখসুবিধার মূল্যহীনতায় এত জোর দেওয়া হইল যে ভারতবর্ষে বিজ্ঞানচর্চার প্রেরণা আর প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হইল না। বিজ্ঞানচর্চা ক্রমশ অধিকতর নিন্দনীয় হইয়া উঠিল! কণাদ এবং তদীয় দর্শনের প্রতি শংকরের বিরাগ সুস্পষ্ট ঃ

তস্মাদেবমসারতরতর্কসংদৃব্ধত্বাৎ ঈশ্বরকারণশ্রুতিবিরুদ্ধত্বাৎ শ্রুতিপ্রবণৈশ্চ শিষ্টৈর্মন্বাদিভির-পরিগৃহীতত্বাৎ, অত্যন্তমেবাঽনপেক্ষাস্মিন্ পরমাণুকারণবাদে কার্যাঽর্যৈঃ শ্রেয়োঽর্থিভিরিতি বাক্য-শেষঃ। ২।২।১৭ সূত্রভাষ্যম্॥

জাতিভেদ প্রথায় জর্জরিত, এবং বেদ পুরাণ স্মৃতি শাসিত, পরলোকে নিবদ্ধ-দৃষ্টি হতভাগ্য হিন্দুজাতির ক্ষুরধার বুদ্ধি এবং অপরিমিত মনীষা বিজ্ঞানের ক্ষেত্র হইতে বিচ্যুত হইয়া অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। গৌরবময় অতীতের ইতিহাস তাহাকে একদিন প্রেরণা দিবে এই উদ্দেশ্যেই হিন্দু রাসায়নী বিদ্যার ইতিহাস আজ তাহার জানা প্রয়োজন।

[illegible] B.M., West [illegible]

॥ ১৩৫০ ॥

১. সাহিত্যের স্বরূপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. কুটিরশিল্প : শ্রীরাজশেখর বসু
৩. ভারতের সংস্কৃতি : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪. বাংলার ব্রত : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫. জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৬. মায়াবাদ : মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ
৭. ভারতের খনিজ : শ্রীরাজশেখর বসু
৮. বিশ্বের উপাদান : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৯. হিন্দু রসায়নী বিদ্যা : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
১০. নক্ষত্র-পরিচয় : অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
১১. শারীরবৃত্ত : ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
১২. প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
১৩. বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ : অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়
১৪. আয়ুর্বেদ-পরিচয় : মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন
১৫. বঙ্গীয় নাট্যশালা : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬. রঞ্জন-দ্রব্য : ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী
১৭, জমি ও চাষ : ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী
১৮. যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি-শিল্প : ডক্টর মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা

॥ ১৩৫১ ॥

১৯. রায়তের কথা : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
২০. জমির মালিক : শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
২১. বাংলার চাষী : শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু
২২. বাংলার রায়ত ও জমিদার : ডক্টর শচীন সেন
২৩. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা : অধ্যাপক শ্রীঅনাথনাথ বসু
২৪. দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি : শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
২৫. বেদান্ত-দর্শন : ডক্টর রমা চৌধুরী
২৬. যোগ-পরিচয় : ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার
২৭. রসায়নের ব্যবহার : ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহ সরকার
২৮. রমনের আবিষ্কার : ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত
২৯. ভারতের বনজ : শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
৩০. ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস : রমেশচন্দ্র দত্ত
৩১. ধনবিজ্ঞান : অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত
৩২. শিল্পকথা : শ্রীনন্দলাল বসু
৩৩. বাংলা সাময়িক সাহিত্য : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪. মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ : রজনীকান্ত গুহ
৩৫. বেতার : ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর
৩৬. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য : শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ